সরস্বতীর পায়ের কাছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চোর আসে একা, ডাকাত আসে দল বেঁধে। চোর আসে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে, ডাকাত আসে হইহই করে, মশাল আর তরোয়াল-বর্শা হাতে নিয়ে। দৈবাৎ কোনও চোর ধরা পড়েও যায়, কিন্তু মাথায় ফেট্টি বাঁধা, জোয়ান চেহারার ডাকাতদলকে প্রতিহত করার ক্ষমতা অধিকাংশ গ্রামের মানুষেরই নেই। চোরদের যেহেতু দেখাই যায় না, তাই অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েদের ধারণা, ভূত-পেতনির মতনই, চোরেরা বোধহয় আলাদা ধরনের প্রাণী, তারা নাকি শুধু একটা নেংটি পরে থাকে, সারা শরীরে জবজব করে তেল মেখে আসে, কেউ তাদের জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেই তারা সুরুৎ করে পিছলে পালায়। সব চোরেরই গায়ের রং কালো-কেলো, ফরসা চেহারার কোনও চোরের কথা কেউ কখনও শোনেওনি, দেখেওনি।

পশুদের মধ্যেও চোর আছে। যারা মানুষের বাড়িতে ঢুকে আসতেও ভয় পায় না। যেমন, ভোঁদড়। এরা জলেও থাকে, ডাঙাতেও

ঘুরে বেড়ায়। অনেক বাড়িতে শয়নকক্ষের ওপরের দিকে কাঠের মাচা বাঁধা থাকে। তাকে বলে কার। তাতে জমা করা থাকে সে পরিবারের কিছু দামি দ্রব্য, গয়নাগাঁটি, কাঁসার থালা-বাসন, আর চিঁড়ে-মুড়ি-গুড়ের সঞ্চয়। যেহেতু অধিকাংশ বাড়িরই টিনের নয়, খড়ের চাল, তাই ভোঁদড়রা অতি নিপুণভাবে চালে গর্ত বানিয়ে নেমে আসে কার-এ। তবে তারা ঘটাং ঘটর, ঝনঝন শব্দ আটকাতে জানে না, তাই সেই শব্দে, বৃষ্টি বা শীতের আরামের রাত না হলে, কোনও কোনও গৃহস্থ জেগে উঠতেও পারে। জেগে উঠলেও তেমন কিছু সুরাহা নেই, কোনও ভোঁদড়কে বন্দি করার সাধ্য আজও কেউ দেখাতে পারেনি।

এক প্রবল গ্রীষ্মের রাতে, আদিনাথ চৌধুরী বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলেন, বুকে-পিঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মাথায় বিদ্যুতের মতন চিড়িক চিড়িক। মাসের পর মাস নারী-সম্ভোগহীন জীবন তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। তিনি আছেন খাটের ওপর, মেঝেতে তাঁর স্ত্রী রেণুকার বিছানা, তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া রুগ্‌ণ শরীর। এখন ছোঁয়ারও অযোগ্য। মায়া লাগে।

কারে ঘটর ঘটর শব্দ শুনে আদিনাথ তন্দ্রা ভেঙে পুরোপুরি জাগ্রত হলেন, কিন্তু উঠে না বসে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাই কে রে, কে ওখানে? যাঃ যাঃ হুস হুস।

আর ঠিক তখনই বাইরে কে যেন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, চোর, চোর, এই জগা ওঠ ওঠ, বাড়িতে চোর ঢুকেছে। এটা এ বাড়ির ছোট ছেলে মানিকের গলা। তার চিৎকারে জগা আর তার এক দাদা জেগে উঠল বটে, কিন্তু এক্ষুনি তো চোরকে তাড়া করার কোনও উপায় নেই। অমাবস্যার রাত, বাইরে ঝিমঝিম করছে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।

এ বাড়িতে সন্ধের পর রান্নার কাজ সব সারা হয় কুপি জ্বালিয়ে। তার বড্ড মোটা মোটা শিখা। সন্ধের পর আর বেশিক্ষণ চলেও না। এ বাড়ির একটি মাত্র হ্যারিকেন বাতিটি সব কাজ-টাজ শেষ করার পর রাখা থাকে আদিনাথের ঘর সংলগ্ন দাওয়ায়। কেরোসিনের দাম দিন দিন বাড়ছে, তাই নিভিয়ে রাখা হয়, কারওর যদি অসহ্য অবস্থার চাপে বাহ্যি-পেচ্ছাপ করতে যেতেই হয়, তখন সে হ্যারিকেনটা নিজে জ্বেলে নেবে। তাও কি সহজ কাজ নাকি? প্রায়ই ওই সময় দেশলাইটা খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্ধের মতন সেটাকে হাতড়ে বার করতে হয়। ভাগ্যবশত, সেটা পাওয়া গেলেও লণ্ঠনটা জ্বালতে জ্বালতে কিছুটা সময় লেগেই যায়। আর চোরেরা কি এমনই ভ্যাবলাকান্ত যে, মানুষের সাড়াশব্দ পেয়েও ধরা দেবার জন্য সেখানে বসে থাকবে?

মানিক উত্তেজিতভাবে বলল, গরমের জন্য বাইরে এসেছি, যদি একটু বাতাস পাওয়া যায়, ওই জামরুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ কে যেন আমার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। দেখা তো যায় না, তবু যেন মনে হল সে গেল ওই গোয়ালঘরের পেছন দিকে।

হ্যারিকেনটা জগার হাতে, সবাই ছুটল গোয়ালঘরের দিকে, বলাই বাহুল্য, সেখানে কেউ নেই। তবু খোঁজাখুঁজি চলল কিয়ৎক্ষণ।

চোর তার কিছুটা চিহ্ন রেখে গেছে উঠোনে। একটা ভাঙা সুটকেস। একটু দূরে একটা জামাকাপড়ের বোঁচকা, একটা ছেঁড়া সোয়েটার। এগুলো কি সে ভয়ের চোটে ফেলে গেছে, না প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি? আর কী কী সে নিতে পারে? কাল সকাল ছাড়া তা বোঝা যাবে না।

আদিনাথ অন্যদের সঙ্গে দৌড়োদৌড়িতে যোগ দেননি, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, স্বামী বিবেকানন্দর মতন বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে দু'হাত রেখে। তাঁর সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাগ। দিনকাল বদলাচ্ছে, চোরেদের সাহসও বেড়ে যাচ্ছে। যে-বাড়িতে এতজন মানুষ, সে রকম বাড়িতে আগে ঢুকতে সাহসই পেত না চোরেরা।

অন্যরা এখন চোর-চর্চা নিয়ে কলরব করছে, আদিনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, জগা, তুই এদিকে আয়। কাল থিক্যা তুই সারা রাইত বাড়ি পাহারা দিবি। ঘুমাতে যাবি সকালে। দশটা-এগারোটার আগে কেউ তোরে ডাকবে না। এই কাজের জন্য রোজ এক গেলাস দুধ তোর জন্য বরাদ্দ হইল।

জগাকে আদিনাথ তো বটেই, অন্য গুরুজনও যেমন খুশি আদেশ করতে পারে, কোনও প্রতিবাদ করার কথা তার মাথাতেই আসে না।

সে এগিয়ে এসে বলল, রাত্র-জাগরণে আমার কোনও অসুবিধা নাই, সকালেও ঘুমাব না, সাত সকালে আপনের জন্য দুধ আর মধু এনে দিবে কেডা? দুপুর বেলা...। মামু, আমি কি সঙ্গে একখান লাঠি-ফাঠি রাখতে পারি?

আদিনাথ বললেন, তা তো রাখবিই। গোয়ালঘরে তিন খান লাঠি আছে, তার একটা বাইছা নিবি।

মানিক বলল, আর দুইখান লাঠিও গোয়ালঘরের বদলে বাড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখাই তো উচিত।

আদিনাথের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটির বাক্যালাপ কয়েকদিন বন্ধ আছে। তিনি মানিকের ওই কথার গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, যাও, এখন সক্কলডি শুইতে যাও।

যে-যার মাথার বালিশের কাছে ফিরে গেল।

বাকি রাতটা মানিকের চোখে ঘুমই এল না। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সে বিছানা ছেড়ে চলে এল বাইরে। বড় দাওয়াটার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে জগা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসল মানিক।

রান্নাঘরে এক গোছা নিমডাল জমা করা আছে। তার থেকে একটা নিয়ে সে দাঁতন করতে করতে চলে এল পুকুরধারে।

এই নরম আলোয় গ্রাম্য প্রকৃতিকে কী সুন্দরই না দেখায়! মানিক পদ্য টদ্য লেখে না। তবে তার কিছুটা সৌন্দর্যবোধ আছে। একটা ঘাস ফড়িং ঘাটের পাশে একটা রক্তজবা গাছের ফুলে এসে একবার বসছে, আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই উড়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, এ দৃশ্য তো যেখানে সেখানে যখন তখন দেখা যায়, কিন্তু কেউ সেদিকে ফিরে তাকাবার যোগ্যই মনে করে না। তবে মানিক সেদিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। তার মনে হয়, এই যে ফড়িংটার বসা আর উড়ে যাওয়া, আবার বসা, আবার উড়ে যাওয়া, এরকম কেন হয়? হয়তো এর মধ্যে কোনও বার্তা আছে। তাকে সেটা শুনতেই হবে।

আকাশ এখন অনেকাংশে নির্মল, শুধু পশ্চিম দিকে জমছে কালো মেঘ। সেদিক থেকেই উড়ে আসছে এক ঝাঁক বক। ওরাই প্রথম আসে। একজন দু'জন করে পুকুরের তিন দিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। তারপর সারাদিন চলবে তাদের খাদ্য-সন্ধানের সাধনা। কিছুটা দূরে মুসলমান পল্লির দিক থেকে ভেসে আসে মোরগের ডাক। প্রতিটি ভোরেই মানুষদের জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব ওদের কে দিয়েছে, কে জানে! তিন দিকে বকেরা এসে বসে, অন্য দিকটা কেন বর্জন করে?

পুকুরের জলে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে মাছেদের ঘাই। পুরো মাছ দেখা যায় না, তবু অভিজ্ঞ লোকেরা ওই ঘাই দেখেই বলে দিতে পারে কোনটা কোন মাছ। মানিকের ধারণা বড় বড় ঘাই মেরে ঢেউ তোলে কাতলা মাছেরা, কারণ তাদের মুড়োটাই অন্য সব মাছের থেকে বড়।

আগামীকাল থেকে ভোরবেলা মানিক আর এই পুকুরঘাটে বসবে না। তাকে চলে যেতেই হবে।

আধ ঘণ্টা পরেই মানিক ছোট্ট একটা পুঁটুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। এখনও কেউ জাগেনি। সোজা রাস্তাটা চলে গেছে বটতলায়, সেখানেই এ গ্রামের শ্মশান। তারপর দুটো রাস্তা দু'দিকে। ডান দিকের রাস্তাটায় মানুষের বসতি খুব কম, ক্রমে দু'দিকেই মাঠ, আর একটা দহ। সেখানে রাস্তাটার অস্তিত্বও কল্পনা করে নিতে হয়। মানিক সেই রাস্তাটাতেই গেল।

খানিক বাদে বাড়ির সবাই যখন সংসার ধর্মে মেতে উঠবে, তখনও কেউ মানিকের অনুপস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। মানিক তো প্রায়ই ভোরে কিংবা মাঝ রাত্তিরে যেখানে সেখানে চলে যায়, কারওর কাছ থেকে অনুমতি নেবারও প্রশ্ন নেই। দুপুরবেলা যে-যার সময় মতন ভাত খেয়ে যায়। বেশি বেলা হলে হয়তো তার পিসি একবার প্রশ্ন করবে, মাইনকাড়া গেল কোথায়? এ প্রশ্নেও কেউ গুরুত্ব দেবে না। মানিক প্রায়ই তার কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়িতে দু'তিন দিন থেকে আসে। সেখানেই খায়-দায়।

মাঠের দু'ধারে এখন বীজতলা রোওয়া চলছে। আগে ধানের চাষই

হত বেশি, এখন চাষিরা ঝুঁকেছে পাটের দিকে। এখন ধানের মূল্য কোনও কোনও বছরে কমে যায়, তাতে বড় ক্ষতি হয়, কিন্তু পাটের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এদিক-সেদিকে গজিয়ে উঠছে চটকল, মাদারিপুরেও নাকি একটা চটকল শুরু হবার কথা শোনা যাচ্ছে।

অনেক বড় বড় মাঠের মধ্যেই হঠাৎ দেখা যায় একটা জঙ্গল ঘেরা জায়গা, যেন সেটা একটা দ্বীপ। ওই সব গাছ কেটে কেন ওখানেও ফসলের চাষ হয় না, তা মানিক জানে না। জমির মালিকানা কার, সে সম্পর্কেও তার কোনও ধারণা নেই। দূর থেকে জায়গাটাকে মনে হয় মরূদ্যানের মতন। বেড়া টেড়া নেই, তাই যে-কেউ ওখানে গিয়ে ইচ্ছে মতন বসে থাকতে পারে, ঘুমনোও চলে।

অনেকক্ষণ হেঁটেছে মানিক, তাই সে মাঠের মধ্যে নেমে একটা দ্বীপের দিকে যেতে চাইল। এখানকার কাদা যেন এঁটেল মাটি, পা আটকে আটকে যায়। তবু কষ্ট করে কোনওক্রমে সেখানে পৌঁছে গেল মানিক। গাছপালার মাঝখানে সেখানে একটা পুকুরও আছে। বেশ টলটলে জল। মানিক আগে উপুড় হয়ে খানিকটা জল খেয়ে নিল, তারপর ধুতে লাগল পায়ের কাদা।

ওপরে এসে একটা ঝোপমতন দেখে মানিক সেখানে ল্যাটা মেরে বসতে যেতেই শুনতে পেল গ-র-র-র আওয়াজ। একটু দূরেই আর একটা ঝোপ থেকে মুখ বার করে আছে একটা জন্তু। শেয়াল নাকি? না, না অন্য কিছু? নেকড়ে বাঘ? হ্যাঁ, নেকড়েই। এরা সচরাচর দল বেঁধে থাকে, তখন ধারে কাছে কোনও মানুষ দেখলে তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। একলা কোনও নেকড়ে সচরাচর দেখা যায় না।

মানিকের প্রথমেই মনে হল, সেই লাঠিটার কথা। তখন এরকম কোনও বিপদের কথা তার মনেই আসেনি। দিনের আলোয় ভয়-টয়গুলো অনেক দূরে সরে যায়।

মানিক গায়ের রোম খাড়া করে দেখতে চাইল, নেকড়েদের সাড়া পাওয়া যায় কিনা। শ্রবণ উৎকর্ণ। কয়েক মিনিট কেটে গেল। নাঃ, আর কোনও শব্দ নেই। নেকড়েটাও শুধু মাথাটা বার করে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মানিকের দিকে।

এমনও হতে পারে, নেকড়েটা কোনও কারণে খুব আহত, তাই দল ছেড়ে এসে এখানে ব্যথা সারাচ্ছে। আহত হিংস্র প্রাণী এক হিসেবে বেশি ভয়ংকর, ওরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে পারে। আবার কিছুটা দূরত্ব রাখতে পারলে ওরা লুকিয়ে পড়তে চায়। মানুষ যেমন হিংস্র প্রাণীদের ভয় পায়, হিংস্র প্রাণীরা তেমন মানুষকে ভয় পেতে পারে। মানুষের মতন হিংস্র তো আর কেউ নেই।

মানিকের একটু একটু খিদে পেয়ে গেছে। এখানে খাবার-টাবার কোথায় পাওয়া যাবে? নেকড়েটার ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি না হলে ঝোপ ছেড়ে বেরোবার চেষ্টা করাটাও ঠিক হবে না।

মানিক তার পুঁটুলিটার গিঁট খুলে প্রথমেই বার করল একটা গোল মাটির ভাঁড়, তার একদিকে একটুখানি কাটা। সেটা নেড়েচেড়ে দেখল মানিক, তারপর মাটিতে দু'তিনবার ঠুকতেই সেটা ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল। তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটা রুপোর টাকা, আর অনেক আধুলি, সিকি, দোআনি, আনি, কিছু তামার পয়সা। এই ভাঁড়টা মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপির পাশে থাকে।

মানিক সে সব গুনতে শুরু করল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে নেকড়েটাকে দেখে নিচ্ছে। সব মিলিয়ে তেতাল্লিশ টাকা আট আনা দু'পয়সা। আর একটা ছোট কাগজের বাক্সতে রয়েছে মোটা মোটা দু'গাছা সোনার চুড়ি, আর কয়েকটা আংটি। এখন সোনার দাম কত চলছে, তা মানিক ঠিক জানে না। তবু গয়নাগুলো বিক্রি করলে অন্তত গোটা তিরিশেক টাকা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। মানিক আরও কিছু গয়না পাবে আশা করেছিল, যাই হোক সব মিলিয়ে মন্দ নয়। এই টাকায়, তার অন্তত ছ'মাসের খাইখরচা চলে যাবে।

গয়নাগুলি তার মায়ের। মা দু'একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছে যে, মানিক বিয়ে করলে নববধূকে তার এই শেষ গয়নাগুলি আশীর্বাদী হিসেবে দেবে। মানিক এখন বিয়ে করতে রাজি নয়, তা হলেও এসব তো মানিকেরই প্রাপ্য। সে আগে থেকে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখছে, এই যা। সুতরাং এর জন্য তাকে চোর-ফোর বলা যায় না।

মানিক জানে, তার মা আর বেশিদিন বাঁচবে না। অনেক কম বয়েস থেকে মানিক দেখে আসছে মায়ের এই অবস্থা। সদাই অসুস্থ, কেউ কোনও বিষয়েই জানতে চায় না তার মতামত। কেউ দেয়নি তাঁর হাতে সংসারের চাবির গোছা। একটা ভরা সংসারের প্রধান হয়েও সবচেয়ে উপেক্ষিত এই রমণী।

মানিক মাঝে মাঝে তার মাকে সাহায্য করার কথা ভাবে, কিন্তু কীভাবে, তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। মায়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতেও সে চায় না, তাতে তার দুটো পা বাঁধা পড়ে যেতে পারে। মনে মনে মানিক বলতে লাগল, বিদায় মা, আর বোধহয় দেখা হবে না। তবু তোমার কথা আমি সবসময় মনে রাখব।

কাছাকাছি একটা হিংস্র জন্তু বসে থাকলে তো আর অন্য কিছুই মনে পড়ে না। সঙ্গে একটা অন্তত লাঠি আনেনি বলে আবার আফসোস হল মানিকের। যদি একরাশ নেকড়ের পাল এসে পড়ে এখানে, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার লীলা খেলা শেষ হয়ে যাবে।

তবু মানিকের মনে হল, এ রকম অকিঞ্চিৎকরভাবে সে কিছুতেই মরবে না। একটা কিছু বড় রকমের অঘটন না ঘটিয়ে এই পৃথিবী ছাড়বে না সে। এখন তাকে বাঁচতেই হবে।

নেকড়েটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, আয় না, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে আরও কিছুদিন বাঁচি।

নেকড়েটা এখন আর গ-র-র-র করছে না, বেরিয়েও আসছে না। তবে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মানিকের দিকে।

কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এখন!

দুই

মানিক নিজের বাবা-মা আর ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হল প্রধানত

দু'টি কারণে। তার মধ্যে প্রথমটাই বেশি গভীর।

বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কটা দিন দিন ঘোরালো হয়ে উঠছে। আদিনাথ আত্মম্ভরী জেদি মানুষ। তাঁর যে-কোনও কথাই এ পরিবারের শেষ কথা। অন্য সবাই তাঁকে সমীহ করে, দূরে দূরে থাকতে চায়।

একমাত্র মানিকই ঠ্যাঁটার মতন মুখে মুখে তর্ক করে তাঁর সঙ্গে। একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব দেখায় না। তর্কের মাঝখানে কোনও কথা খুঁজে না পেলে তখনই আদিনাথ ছোট ছেলেকে চাবুক-পেটা শুরু করেন। অবাধ্য সন্তানকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার সব বাবারই থাকে।

মানিক যে ইদানীং বাবার প্রতি অবনত হবার ভাব দেখায় না, সে কথাটা তো সত্যিই। বাবার এক বন্ধুর মেয়ে পদ্ম মানিককে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মানিক তাতে রাজি হয়নি। এ মেয়েটিকে মানিক বাল্যকাল থেকে দেখেছে, একসঙ্গে ডান্ডা-গুলি আর চোর-চোর খেলেছে কতবার, ওর সঙ্গে অন্য কোনও সম্পর্কের একটু ইঙ্গিতও তার মনে আসেনি কখনও।

পদ্ম মরিয়া হয়েই নিশ্চয়ই এসেছিল কাছে, নিজের মুখে সে এই প্রস্তাব দিয়েছিল। পদ্মর বয়েস হয়ে যাচ্ছে, মানিকের থেকে মাত্র দু'তিন বছরের ছোট, তবু তার বিয়ে হচ্ছে না বেশি পণের টাকা আর সোনার গয়না দেবার ক্ষমতা নেই বলে।

মাঝে মাঝেই পাত্রপক্ষ ওকে দেখতে আসে, বেলের পানা আর খাজা-গজা খায়, তারপরই মাথা নেড়ে চলে যায়। পদ্মকে এই অপমান আর সংকট থেকে বাঁচাবার জন্যই মানিক তাকে বিয়ে করে ফেলবে, এটাও তো ঠিক নয়। মানিক এখন বিয়ে করবে না, ওই সম্পর্কের ফাঁদে আটকা পড়তেও রাজি নয়। এখন যদি কোনও রাজকন্যার সঙ্গেও তার বিয়ের প্রস্তাব আসে, তাও মানিক এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে।

হঠাৎ শোনা গেল পদ্মকে বিয়ে করতে চান মানিকের বাবা আদিনাথ। প্রথমে সবাই অবিশ্বাস করেছিল, যেন একটা রসে ভরা গুজব। তারপর উদ্যোগ শুরু হতে দেখে তারাই বেশ হাসাহাসি করল, এখন আবার অনেকে বলাবলি করতে লাগল তা মন্দ কী, ওই লোকটার শরীরে সাপের বিষ আছে, তাতে ওর বীর্যক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে নিশ্চয়ই। মেয়েটা তো বেঁচে যাবে।

তখন মানিকের মনের অবস্থা খুবই জটিল। এই ঘটনায় মানিকের মতামত কেউ জানতে চায়নি, পদ্মকেও কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। যে-মেয়েটি তার স্ত্রী হতে চেয়েছিল, সেই মেয়েই এই সংসারে আসবে মায়ের ভূমিকা নিয়ে। মানিকের চোখের সামনে সে ঘুরবে, ফিরবে, দু'জনের চোখাচোখিও হবে। এসব মানিক সহ্য করবে কী করে?

এর মধ্যে পদ্মর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। দুই বাবার এই পাগলামি সে কি লক্ষ্মী মেয়ের মতন মেনে নিয়েছে? হঠাৎ একদিন, হাট থেকে বহু মানুষ ফিরছে, রাস্তায় নেমে এসে সবাইকে দেখিয়ে, গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল পদ্ম। এটাই তার প্রতিবাদ।

মেয়েটা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল ঠিকই। কিন্তু তার মুখে-ঘাড়ে যদি আগুনের ঝাপটা লেগে থাকে, সে দাগ আর মুছে যাবে না। তাকে কুৎসিত দেখাবে। তাহলে তো তার বিয়ের সম্ভাবনা আরও রইল না।

পদ্মর ওই কাণ্ডের পর সব ব্যবস্থাই ভন্ডুল হয়ে গেল। আপাতত। কিন্তু বাবার প্রতি সেই ঘৃণার ভাবটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না মানিক।

চাবুকের মার খাওয়া মানিকের সহ্য হয়ে গেছে। সে কাঁদে না, কারওর কাছে দয়া চায় না, নিঃশব্দে মার খেয়ে যায়, তার মা রেণুকা দূরে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল চাপা দেন। এ বাড়িতে তিনি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, তিনি কিছু বলতেও পারেন না। দু'একবার অবশ্য পিসিমা দৌড়ে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছেন, তুই আমাকে মার আদি, ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দে। তুই কি ওরে একেবারেই মাইরা ফেলতে চাস!

তখন মানিক দৌড়ে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গায়ের রক্ত-টক্ত সব ধুয়ে নেয়, শুধু একবার, প্রচণ্ড মারের পর জ্বর এসে গিয়েছিল মানিকের, কবিরাজ ডাকতে হয়েছিল তার জন্য।

গত শনিবার কি শুক্কুরবার, হ্যাঁ শুক্কুরবারই হবে, মার খাওয়ার সময় হঠাৎ একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটল। তা অবশ্য মানিক ছাড়া আর কেউ জানে না। কারণ সেটা ঘটেছে মানিকের মনে মনে। হঠাৎ একসময় মানিকের মাথায় দপ করে জেগে উঠল রাগ। একটা প্রচণ্ড আগুনের গোলার মতন। মানিক ভাবল, শুধু শুধু পড়ে পড়ে মার খাব কেন? ওই চাবুকটা কেড়ে নিয়ে বাবাটাকে এবার কয়েক ঘা দিতে হবে। চাবুকটা কেড়ে নেবার জন্য সে হাতও তুলেছিল। তখনই তার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, এ কী মানিক, তুমি কী কাণ্ড করতে যাচ্ছ? বাবার গায়ে হাত তুলবে? ছি ছি ছি, উনি তোমার জন্মদাতা, উনি না থাকলে এ পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্বই থাকত না। এই চরম পাপের বোঝা তুমি মাথায় নিয়ো না। যদি কোনও ছেলে বা মেয়ে, বাবা কিংবা মাকে প্রহার করে, তাদের স্থান হয় পুন্নাম নরকের সবচেয়ে নীচে।

সেদিন মানিক কোনওক্রমে নিজেকে সংযত করতে পেরেছিল। কিন্তু তার পরেও মনে হয়েছিল, আবার যদি এই ইচ্ছেটা জাগে? যদি বাবাকে একদিন মেরেই বসে! নিজের ওপরেই সে আস্থা হারিয়ে ফেলছে। সে পাপ-পুণ্যের তোয়াক্কা করে না, সেই জন্যই এখন বাবার কাছ থেকে দূরে থাকা দরকার। অনেক দূরে, হয়তো বাবার সঙ্গে তার সারাজীবনে আর দেখাই হবে না।

মানিক যে-ইস্কুল থেকে গতবার পরীক্ষা দিয়ে ফেল মেরেছিল, সেই স্কুলের হেডমাস্টার রফিকুল ইসলাম তার মনে বড্ড দাগা দিয়েছেন। মানিকের মার্কশিটটা নিয়ে তিনি বললেন, হুঁ, দু' সাবজেক্টে ফেল। তার মানে? সারা বছর তুই পড়াশুনো কিছুই করিসনি। আমার কী যে দুঃখ হয় জানিস? তোরা ব্রাহ্মণ, সমাজের সবচেয়ে উঁচুতে ব্রাহ্মণের স্থান। তোদের চাষ-বাস করতে হয় না, হাটে-বাজারে ঘোরাঘুরি করতে হয় না। সাধারণ মানুষ চেয়েছে তোরা লেখা-পড়া আর জ্ঞানচর্চা করবি। প্রয়োজন হলে মানুষকে উন্নত জীবনযাপনে পৌঁছবার জন্য পথ দেখাবি। অনেককাল তো তা-ই ছিল। এখন দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া, বামুনেরা আর জ্ঞানচর্চা করে না, ভাল করে

প্রাথমিক লেখাপড়াও শেখে না। মন্দির-টন্দিরের পুজোর সময় পুরুতরা অং বং চং বলে কীসব মন্ত্র পড়ে, তা শুদ্ধ কি ভুল, তা বোঝারও মানুষ নেই। এখন তো দেখছি, অনেক বামুনই ছোটখাটো জমিদারদের কাছে মোসাহেবি করে। প্রজাদের ভয় দেখিয়ে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। তুইও নিশ্চিত সেই পথেই যাবি।

আত্মপক্ষ সমর্থনে মানিক বলতে চেয়েছিল যে, স্যার আমি যদি কারওর কাছ থেকে লেখাপড়ায় একটু সাহায্য পেতাম...। কিন্তু সে একথা উচ্চারণ করতে পারল না, হঠাৎ তার কান্না এসে গেল। রফিকুল স্যারের কাছ থেকে সে পালিয়ে বাঁচল।

এদিকে নেকড়ে বাঘটার থুতনি মাটিতে ঠেকে গেছে, ওর আর উঠে দাঁড়াবার আশা নেই। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মানিক, ওকে এখন যেতে হবে পীরখানি নামের গ্রামে। রাস্তা সে আগেই দেখে রেখেছে। পীরখানি গ্রামের জমিদার রাধেশ্যাম মল্লিক এক বিচিত্র মানুষ। তিনি নিজেই বেশ শিক্ষিত, তিনি খুব দরিদ্র কিংবা অভাবগ্রস্ত পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। প্রতিদিন নিজে এসে দেখে যান সেই শিক্ষাপ্রকল্প কেমন চলছে। আবার তিনি নাকি খুব দুশ্চরিত্র আর ব্যাভিচারী। পঞ্চ মকারের কোনওটাই বাদ দেন না। গ্রামের সাধারণ মানুষও বেশ সচ্ছল, কারণ এখানে এত সূক্ষ্ম কাজ করা শাল তৈরি হয়, দেশ-বিদেশে সেই শালের খুব চাহিদা, ভাল দামও পাওয়া যায়।

পীরখানি গ্রামে ঢোকার আগে মানিক দেখল, একটা বটতলায় বসে একজন পরামানিক একটি বাচ্চা ছেলের চুল ছেঁটে দিচ্ছে। সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল মানিক। ছেলেটার কাজ শেষ হতেই মানিক হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা এগিয়ে দিল পরামানিকের ক্ষুরের নীচে। আবার কী মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে এনে সে পরামানিকটিকে জিজ্ঞেস করল, ন্যাড়া হব। কত?

পরামানিকটি এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, ভাইডির বাড়ি কোথায়?

মানিক বলল, সে অনেক দূরে। জলদি করো, কত দিতে হবে?

অচেনা বিদেশি লোক দেখলে বেশি দাম চাওয়ার প্রথা। সে বলল, ছয় পয়সা।

মানিক আঁতকে উঠে বলল, সে কী? আমাদের ওখানে তো দুই পয়সা আর এক আধলা দিলেই কাজ হয়ে যায়।

পরামানিক বলল, তাহলে সেইখান থিকাই কাজ সেরে আসেন কর্তা।

এরপর মানিক ওর সঙ্গে দরাদরি চালাল দশ-পনেরো মিনিট।

সে যে ছ'পয়সা দিতে পারে না, তা তো নয়। তবে, দাম শুনেই সঙ্গে সঙ্গে তাতে রাজি হওয়া বড়লোকির লক্ষণ। তার কাছে যে বেশ কিছু টাকা-গয়না আছে, সে কথা খুব সাবধানে গোপন রাখতে হবে। জানাজানি হলেই কিছু লোক তার পিছু লাগবে। কেউ তার গলার নলিটা কেটে দিতেও পারে।

শেষপর্যন্ত সাড়ে চার পয়সায় রাজি হল মানিক।

বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যু হলে সন্তানদের ন্যাড়া হতেই হয়। অনেক মা তাঁদের চার-পাঁচ বছরের সন্তানদের মাথা ন্যাড়া করিয়ে দেন, তাতে নাকি নতুন চুল ভাল গজায়। বামুনের ছেলেদের অবশ্য আরও একটি দায় আছে, ন্যাড়া হতে হয়, মানিকও হয়েছিল। সেটা উপনয়নের সময়। ইস্কুলের ছেলেরা তাকে ন্যাড়ামুন্ডি ন্যাড়ামুন্ডি বলে মাথায় চাঁটি লাগাত।

এখন মানিক ন্যাড়া হচ্ছে, মাথায় চুল না থাকলে সহসা মানুষকে চেনা যায় না।

মানিক লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাই, তুমি কী বলতে পার, এখানকার জমিদারবাবুর সঙ্গে একবার কী করে দেখা পাওয়া যায়?

সে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, সূর্যদেবতা এখন ঢালে যাচ্ছেন, আর তো এদিন তিনি আর কারওকে দর্শন দেন না। আবার কাল সকালে।

মানিক বলল, সকালে কোথায়?

সে বলল, ওই যে সুমুখের একটা চাতাল দেখছ, ওই থেকে তিনি চেয়ার পেতে বসেন।

মানিক বলল, বাঃ তাহলে তো খুব ভাল হল। সকালে উনি ক'টার সময় বসেন?

এবারে পরামানিক খানিকটা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, ক'টা মানে, কিসের কটা? ঘড়ির? সারাজীবনে কি আমি ঘড়ি দেখতে শিখেছি? শিখেই বা কী লাভ। না শিখেও তো দিব্যি চলে যাচ্ছে।

মানিক বলল, তা অবশ্য ঠিকই।

সে বলল, যাও, যাও আমি আর কিছু জানি না। ওই যে ঝাঁকড়া নারকোল গাছটার ছায়া এদিকে এই নয়নতারার ঝোপে এসে পড়ে, তখনই রাজাবাবুর আসার সময়।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে মানিক আবার হাঁটা শুরু করল, কাল সকাল থেকে এখানে এসে বসে থাকতে হবে। এখন তার দরকার, রাত্তিরটায় মাথা গোঁজার মতন একটা স্থান। আর কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

না, এ গ্রামে কোনও সরাইখানা নেই। আছে শুধু একটা মুদিখানা আর একটা মাংসের দোকান, সেখানেই কেরোসিনও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দোকানটি এখন বন্ধ। মানিক মুদিখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এখানকার পরিবেশটা বুঝে নেবার জন্য।

লোকে এসে ডাল কিনছে, মশলাপাতি কিনছে, নুন কিনছে, তেল কিনছে, কেউ কিন্তু চাল কিনছে না। তার মানে, প্রায় সবারই কিছু জমি আছে, তার থেকে খোরাকি ধান পেয়ে যায়, তাতেই সম্বৎসর চলে যায়। আর মাংসের দোকান? এ তল্লাটের কোনও গ্রামে মাংসের দোকান আছে বলে মানিক সাতজন্মে শোনেনি। মাংস তো রোজ পাওয়াও যায় না। উৎসবে বা যাত্রাপার্টি এলে দিলু কামার একটা ছাগল এনে রাস্তার পাশেই কাটে, যতক্ষণ ছাল ছাড়াতে লাগে, ততক্ষণ কিছু লোক অতি লোভীর মতন চেয়ে থাকে সেদিকে। তারপর বিক্রি শুরু হতে না হতেই সব শেষ হয়ে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবসা শেষ। তাতে আর দোকান লাগে কিসে? এখানে কি তা হলে প্রতিদিনই মাংস পাওয়া যায়!

এক সময় খদ্দেররা সব চলে গেলে মানিক সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের মালিক একজন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি, তার চোখে চশমা। চশমা পরা মানুষ এদিকে খুবই দুর্লভ, তাও বাবু শ্রেণির কিছু মানুষ পরে। আর এই চশমা এমনি এমনি তাদের মুখে একটা ব্যক্তিত্ব এনে দেয়।

সে বলল, নমস্কার। আপনার এখানে মুসুর ডালের সের কত করে চলছে?

চিরাচরিত প্রথায় মালিকটি জিজ্ঞেস করল, মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে, নিবাস কোথায়?

মানিক মিথ্যে করে বলল, আমাদের গ্রামের নাম চিতলমারি। আপনি সে গ্রামের নাম শুনেছেন?

মালিক একটু শ্লেষের সঙ্গে বলল, নাম শুনতেই হবে! ও গ্রামে আহামরি কিছু আছে নাকি? চিতলমারি, বোয়ালমারি, ইলিশমারি নামে কত গ্রাম আছে, সে সব জায়গায় খুবই মেছো গন্ধ।

মানিক বলল, তা আমাদের গ্রামের কিছু নাম-ডাক আছে। এই জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় রথ আছে, দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মানুষ সেই রথ টানতে আসে।

মালিকটি বলল, মুসুর ডাল এখন এস্টকে নাই। খেসারি আর সোনামুগ পাবেন।

মানিক ডাল কেনার প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলল, এখানে রাত্তিরে থাকার জন্য কোনও আস্তানা পাওয়া যাবে? আমি কিছু ভাড়া দিতেও রাজি আছি।

দোকানের মালিক : হিন্দু না মোছলমান!

মানিক বলল, হিন্দু তো অবশ্যই। আমার বাপ-ঠাকুর্দা...।

দোকানের মালিক : মোছলমানদের জন্য এখানে একটা এতিমখানা আছে। ওদের জ্ঞাতি-গুতি কেউ এলে সেখানেই শোয়। হিন্দুদের সেরকম কিছু নাই। যদি কোনও গেরস্ত দয়া করে আশ্রয় দেয়—কী কারণে মশাইয়ের এ গ্রামে আগমন?

মানিক বলল, ডাল কিনতে গেলে... না, কোথায় আশ্রয় চাইলে বুঝি এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আগে?

মালিক : বাবু, আপনি চোর না ডাকাইত, ফেরেববাজ না জালিয়াত, সেটা আগে জেনে নিতে হবে না?

মানিক তখনই বুঝে নিল যে, এই লোকটির সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে কথা বলায় তার কোনও কাজ হবে না। বরং একে কিছু তোল্লা দিলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যেতে পারে।

সে এবার খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, মহাশয় আমি অতি দীন-সাধারণ মানুষ, চোর-ডাকাতের কথা শুনলেই ভয়ে কাঁপি। আমি খেজুরের রস আর পাটালি গুড়ের একটা ব্যবসা শুরু করেছি। তাও খুব সামান্য। টাকা তো হাতে নেই, শুরুই করেছি ধার-দেনা করে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে বসে এ ব্যবসা চালানো খুব শক্ত, সবাই ধার চায়, মূল্য দেয় না। তাই নতুন জায়গায় এসে আমার ভাগ্যটা বুঝি নিতে চাই। আপনার মতন মানুষের কাছে যদি একটু সাহায্য পাই....আপনার সাথে আমার এক জ্যাঠামশাইয়ের মুখের খুব মিল আছে, তিনি আমায় এত ভালবাসতেন...

দোকানের মালিক এসব শুনেও বিগলিত না হয়ে মানিককে কিছুটা তুচ্ছ জ্ঞান করল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, আপাতত তোমার সমস্যা আজ রাতের মতন একটা মাথা-গোঁজার জন্য একটুখানি স্থান। আবার বৃষ্টি আসতেছে, খোলা মাঠে তো শুইতে পারবা না। গ্রামের মধ্যে ঘুইরা ঘুইরা দেখো, যদি অন্য কিছু না পাও, এই দোকানের মধ্যেই আইস্যা শুইয়া পড়ো। আমার দুইডা কর্মচারী এইখানেই ঘুমায়। তারপর বিষ্ণু বিষ্ণু বলে কাকে যেন হাঁক দিল।

মানিক ধরে নিয়েছিল, ওই নামে কোনও দুরন্ত ধরনের কিশোর আসবে। ও মা, এলো এক হাড়-জিরজিরে বৃদ্ধ। এরই নাম বিষ্ণু?

মানিককে দেখিয়ে দোকানি বলল, এই মানুষটারে দেইখ্যা রাখ, ও আজ রাইতে তোগো সাথে শোবে। ব্যবস্থা ঠিকঠাক কইরা দিস।

তারপর মানিককে বলল, একটা ব্যবস্থা তো হইয়াই গেল। শোনো, মাইঝ রাতে বাইরে অনেক কুকুর ডাকবে, তাতে ভয় পাইয়ো না।

মানিক সেই লোকটির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করল। রাত্রের জন্য একটা আস্তানা ঠিক না থাকলে সারাদিনই মন খুঁতখুঁত করে। যাক, সেটা তো মিটল। মানিক মুখে কিছু বলল না, মালিকের দিকে তাকিয়ে তার মুখটাই এমনভাবে বদলে গেল, দেখেই বোঝা যায়, মালিকের কৃপার জন্য, সে সারাজীবন ধন্য আর কৃতজ্ঞ থাকবে।

এই সব গ্রামে একটাই থাকে মূল রাস্তা, তার এদিকে ওদিকে সরু সরু গলি। যেমন নদী আর শাখানদী। মানিক মূল রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর বুঝতে পারল, সে যেন একটা বেশ দর্শনীয় বস্তু। অনেকেই উঁকিঝুঁকি মারছে আড়াল থেকে।

এইরকমভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে কিছুই লাভ নেই, মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা না বলতে পারলে কিছুই জানা যাবে না। মাঝেমাঝে বাচ্চা ছেলেদের খেলার দৃশ্য ছাড়া, আর কোনও মানুষই চোখে পড়ে না। কোনও একটা বাড়িতে কড়া নেড়ে দেখবে? মানুষের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টার মধ্যে তো দোষের কিছু নেই। তবে, কোন বাড়ি?

মানিক ঠিক করল, এরপর হাঁটতে হাঁটতে সে মনে মনে গুনবে কুড়ি পর্যন্ত, তারপর যে-বাড়িটি চোখে পড়বে সেখানেই সে যাবে।

মাঝেমাঝে কিছু ঝোপঝাড়, ফাঁকা জায়গা, এরই মধ্যে আসে এক একটা বাড়ি। কুড়ি গোনার পরেই একটা বাড়ি, সে বাড়িটির সামনে দেওয়াল টেওয়াল বেশ পরিচ্ছন্ন। একতলা, টিনের চাল, পেছন দিকে দেখা যাচ্ছে আকাশে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘ। বেশ কয়েকটা প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে সেখানে।

মানিক দরজাটায় মৃদুভাবে একটা কিল মারতেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। সেখানে এক তরুণী দাঁড়িয়ে, তার ওপরের পাটির একটা দাঁত নেই, চোখ দুটিও সামান্য ট্যারা।

সে খুব উত্তেজিতভাবে বলল, এসেছিস, এত দেরি করলি। শিগগির ভেতরে আয়।

সে মানিকের হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাও বন্ধ করে তুলে দিল খিল।

তারপর আবার বলল, খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। খোল, সব কিছু খোল।

সে তার শাড়িটা খুলে ফেলতে লাগল, শাড়ির নীচে আর কিছু নেই।

ঘটনার আকস্মিকতায় মানিক এমনই ঘাবড়ে গেল যে, একটা ঢোঁক আটকে গেল তার গলায়। তারপর সে বলল, এ কী, এ কী, আপনার কিছু ভুল হচ্ছে!

এ কথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে মেয়েটি বলল, বললাম না হাতে বেশি সময় নেই। তুই আমাকে কর, তারপর অন্য সব হবে।

মানিক বলল, না, না, না, না।

মেয়েটি বলল, আমার সারা শরীলডা জ্বলছে রে, নদাই, আমি আর থাকতে পারছি না। আয়, আমারে তুই কর! তুই কথা দিয়েও এত দেরি কেন করিস রে? খোল, সব খোল, আমরা এখনই শুরু করি।

মানিক বুঝল, সে একটা মারাত্মক ভুলের জালে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সে এই মেয়েটিকে জীবনে আগে কখনও দেখেনি, তাই কথা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। মেয়েটি যা চাইছে, তারও কোনও অভিজ্ঞতা নেই তার। এ বাড়িতে সে এসেছে, তাও তো নিছক একটা চান্সের ব্যাপার। সে যদি মনে মনে কুড়ির বদলে তিরিশ গোনার কথা ভাবত, তাহলেই তো চলে যেত অন্য বাড়িতে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তার নাম নদাই নয়।

মেয়েটি রভসযাতনায় যেন কাঁপছে। সে এখন পুরোপুরি নগ্ন, হাত বাড়াল মানিকের দিকে। মানিক পরে আছে ধুতি আর হলদে রঙের ফতুয়া। মেয়েটি তার ধুতির গ্রন্থি খোলার চেষ্টা করল।

মানিক বলল না, না। এসব আমি কিছুতেই করতে পারব না। আমায় মাপ করুন।

মেয়েটি এবার হিংস্র ভাবে বলল, কেন পারবি না হারামজাদা?

আগের দিন অত ভাল পেরেছিলি—

এর মধ্যে সে মানিকের ধুতির বাঁধন প্রায় খুলে ফেলেছে। মানিক সে জায়গা হাত ধরে চেপে ওকে আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। সে বুঝতে পারল যে, তর্কাতর্কির বদলে এখান থেকে এক্ষুনি পালানো ছাড়া গতি নেই।

সে কোনওক্রমে একটুক্ষণ ঝটাপটি করে মেয়েটির হাত সরিয়ে দিল, সরে এল দরজাটার কাছে। খিলটা এমন আঁট হয়ে আছে যে, চেনা লোক ছাড়া কেউ সহজে খুলতে পারবে না।

নগ্ন মেয়েটি হি-হি-হি করে একটা পেত্নির মতন হেসে পেছন দিকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওরে নদাই, নদাই রে, আয় আমরা বিছানায় শুই, খুব নরম বিছানা। তিনটে পাশবালিশ—

খিলটা হঠাৎ খুলেও গেল মানিকের হাতে। সে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে চলে এল বাইরে। তারপর সে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটতে লাগল বড় রাস্তা দিয়ে।

বাপরে বাপ, ওই মেয়ে কি রাক্ষসী? হতেও পারে।

কেউ যদি মানিককে দেখতে পেয়ে যায়, তবে কি সে ভাববে যে, ওই মেয়েটির সঙ্গে কুকর্ম সেরে এখন সে দৌড়ে পালাচ্ছে? কিংবা আরও কেউ কী ভাববে, তা মানিক জানবে কী করে?

রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড়লে অনেকেই দেখে ফেলতে পারে, একপাশ ঘেঁষে যাওয়াই ভাল। মানিক একবার দেখে নিল, কেউ তাকে তাড়া করে আসছে না।

ডান দিকে না বাঁ দিকে? একবার চোখ বুজে আবার খুলতেই মানিক দেখল ডান দিকে রয়েছে একটা ঝাঁকড়া মতন তেঁতুল গাছ। কাছাকাছি আর কোনও বাড়িঘর নেই।

মানিক গিয়ে বসে পড়ল সেই গাছতলায়। তারপর অসম্ভব জোরে হাঁপাতে লাগল। যেন বুকটা তার ফেটে যাবে। সে ভয় পেয়ে এত জোর ছুটেছে, আগে কখনও এত জোরে দৌড়য়নি। বাপরে বাপ, কী সাঙ্ঘাতিক এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল সে। ও কি সত্যিকারের মেয়ে, না এক ডাইনি? যেন আর একখানা শূর্পনখা।

ধুতিটা ঠিক মতন পরে নিতে নিতে মানিক দেখল এরই মধ্যে দৃঢ় আর খাড়া হয়ে আছে তার পুরুষাঙ্গ। এ কী ব্যাপার? এক রমণীকে ভয় পেলে বা ঘৃণা করলেও তার ওপর আবার কামনাও জেগে ওঠে?

এই উনিশ বছর বয়েসে মানিকের যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটা করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে। আবার খিদেতেও পেট জ্বলছে তার। কিছু খাবার জোটানোর সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

এরকম একটা সমৃদ্ধ গ্রাম, যেখানে মাংসের দোকান আছে, কিন্তু খাবারের দোকান নেই। একটা কোনও বাড়িতে আশ্রয় চাওয়া যায় না? তারপরই সে শিউরে উঠল। অন্য বাড়ি? সেখানে আবার কী কাণ্ড ঘটবে কে জানে। সন্ধে হয়ে আসছে, এখন তো এমনিতেই কোথাও গিয়ে কিছু চাওয়া উচিত নয়।

মানিক এবার উল্টোদিকে ফিরল। দৌড়ে নয়, মাঝারি গতিতে পা চালিয়ে সে একসময় পৌঁছে গেল সেই মুদিখানাটার সামনে। এর মধ্যেই দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেছে। তবে দু'জন কর্মচারী, তাদের একজন সেই বিচ্ছু, ভাঙা পাথরের একটা উনুন বানিয়ে তার ওপর মাটির হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছে। টগবগ করে ফুটছে সেই ভাত।

মানিক দু'বার জোরে জোরে শ্বাস নিল। ভাত রান্নার গন্ধ যে এত মধুর হয়, তা সে এতদিন জানেনি। তার মনে হচ্ছে, কতদিন যেন ভাত খায়নি সে।

এরা কি তাকে একটুখানি ভাগ দেবে?

সেই বিচ্ছু বুড়ো তাকে দেখে বলল, এই বগা, একখান বিড়ি দে তো।

মানিক বলল, আমি তো বিড়ি খাই না।

লোকটি মানিককে ভেংচিয়ে বলল, আমি তো বিড়ি খাই না! এই পশ্চিমা পুত, তুই বিড়ি খাস নাকি খাস না তা কেডা জানতে চায়।

খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। খোল, সব কিছু খোল।

আমাগো জন্য তোর জেবে বিড়ি রাখস না ক্যান?

মানিক চুপ করে রইল।

সেই বুড়ো আবার বলল, তুই এহনি শুইয়া পড়তে চাস? যা, যা, ভিতরের ঘরে গিয়ে হাত-পা চ্যাটাইয়া শুইয়া পড়। আর শোন, ডাইন দিকের দেওয়ালের ধারটা আমার। তারপর এই ক্ষ্যাপাইচণ্ডীর, এই ছাড়া তোর যেখানে ইচ্ছা।

ক্ষ্যাপাইচণ্ডী নামের ছেলেটি একবার মানিককে দেখল।

এরপর তো ভাত চাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর নীচে নামতে পারবে না মানিক।

একটা কাটা দরজা দিয়ে সে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা খুব অন্ধকার নয়, পেছন দিকের একটা ঘরে কিছু একটা আলো জ্বলছে। মানিক গেল সেই ঘরটার দিকেই।

বেশ বড় ঘর, আলো আসছে একটা দেওয়ালগিরি থেকে। এক পাশে ডাঁই করে রাখা আছে অনেকগুলো খালি বস্তা। দু'তিনটে বস্তা এর মধ্যে ভর্তি কিংবা আধা ভর্তি, ভেতরে কী আছে, তা কে জানে।

মাঝখানের অনেকখানি জায়গা খড় বেছানো রয়েছে। এটাই তাহলে বিছানা। মানিক ডানদিকের দেওয়ালটা দেখে নিল। মাটির দেওয়াল, তবে ওই দিকটা বেশ পরিচ্ছন্ন।

মানিককে আজ নিরুপায় হয়ে পেটে কিল মেরেই থাকতে হবে শুয়ে। পেটে খিদে থাকলে সহজে ঘুম আসে না। আর অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হবে নিশ্চিত। টাকা-পয়সা আর গয়নাগাঁটিগুলো একটা পুঁটুলিতে বেঁধে সে গুঁজে রেখেছে তার ফতুয়ার নীচে। মাঝে মাঝেই সে হাত দিয়ে দেখে নেয় সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা।

আর তো কিছুই করার নেই। জামা-কাপড় বদলাবারও ব্যাপার নেই, কারণ সঙ্গে কিছুই আনেনি। তার বোঁচকাটার মধ্যে রয়েছে কিছু বই-খাতা, তাই মানিক শুয়েই পড়ল। তখনই তার উপলব্ধি হল চিরকালের মতন বাড়িঘর ছেড়ে আসতে গেলে কিছু কিছু প্রস্তুতি দরকার। বাড়িতে চোরের ব্যাপারটা সে ভালই সাজিয়েছে, মূল্যবান জিনিসগুলো সেই অদেখা চোরই নিয়ে গেছে, এটা মনে করাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে যদি থানা-পুলিশ হয়, তবে তারা সেই চোরকেই খুঁজবে। মানিকের কয়েকটা দরকারি জিনিস কয়েকদিন আগেই লুকিয়ে রাখা উচিত ছিল অন্য কোনও জায়গায়। অবশ্য গৌর-নিতাইয়ের মতন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য ওসব কিছুই লাগে না।

অবশ্য একটু পরেই তার উপলব্ধি হল, বাবার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে সে যদি নিজের জীবনটা নিজের ইচ্ছেতেই গড়ে নিতে চায়, তাহলে তো তাকে অনেক বাধা ও কষ্ট সহ্য করতে হবেই। না খেয়ে থাকতে হবে কোনও কোনও দিন, অনেক বাধা ও অসম্মান মেনে নিতে হবে, তবুও টিকিয়ে রাখতে হবে মনের জোর। শুধু মনের জোরেও হবে না, সবসময় অন্যের ওপর আধিপত্য করার চেষ্টাও বহাল রাখতে হবে।

এইসব কথা চিন্তা করার পরও মানিকের খিদের জ্বালাটাও যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। এবং অন্য দু'জন ফিরে আসার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ল মানিক। সারা দিন সে অনেক হাঁটাহাঁটি করেছে, তাই শরীরে জমে আছে অনেক ক্লান্তি।

মাঝরাত্তিরে তার ঘুম একবার ভেঙেছিল, তখন সে যেন শুনতে পেয়েছিল, পাশের দু'জন যেন কোস্তাকুস্তি করছে। মানিক তা মাথায় নিতে পারল না, ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

যথারীতি মানিকের ঘুম ভাঙল সবার আগে। পাশের দিকে চেয়ে দেখল, বুড়ো আর সেই তরুণটি এমনভাবে জড়ামড়ি করে আছে, তাদের দেখলে হঠাৎ মনে হতে পারে দুটো মুন্ডুওয়ালা কোনও অদ্ভুত প্রাণী।

ঘুমের মধ্যে কিংবা ঘুম ভাঙার সিদ্ধান্ত নেবার পরের মুহূর্তেই মানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, এই পীরথালি গ্রামে থেকে যাওয়াটা কিছুতেই তার পক্ষে সুবিধেজনক হবে না। এ গ্রামের হাওয়াই যেন কেমন গম্ভীর গম্ভীর। যেন যখন তখন একটা বাঘ বা দৈত্য আসবে।

মানিক সেই মুদিখানার থেকে একটু দূরে একটা কালভার্টের ওপর বসে রইল। এক সময় বিষ্টু বুড়ো এসে দোকান খোলার পর সে দেখল, সেখানে এক বৈয়মের মধ্যে রয়েছে কয়েকটা বিস্কুট। মানিক সঙ্গে সঙ্গে তিন পয়সায় কিনে নিল সব কটা।

মানিক তার একটা মুখে দিতেই পেল একটা বদ গন্ধ। সেই বিস্কুটগুলো এতই পুরনো যে, তাদের ওপর পড়ে গেছে হালকা নীল রঙের আস্তরণ। মানিকের একবার ওয়াক তুলে বমি এসে গেল পর্যন্ত, তবু সে খেয়ে গেল একটার পর একটা!

আশ্চর্য ব্যাপার, এক সময় যখন খেজুর গাছটার কিছুটা ছায়া এসে পড়ল এদিককার একটা ঝোপে, তখনই দূর থেকে আসতে দেখা গেল জমিদারবাবুকে।

সামনের চাতালটিতে তাঁর জন্য একটি চেয়ার পাতা আছে, সেটার সামনেই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে কুড়ি-বাইশ জন নারী-পুরুষ আর স্কুলের ছাত্র ছাত্রী।

এ গ্রামের জমিদার রাধেশ্যাম মল্লিকের চেহারা সত্যিকারের জমিদারেরই মতন। যাত্রা-থিয়েটারে যেমন দেখা যায়। ফরসা, সুপুরুষ, বেশ লম্বা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, গোঁফটাও বোধহয় তাই। পরনে ফিনফিনে আদ্দির কুর্তা, শ্বেতশুভ্র ধুতি। হাতে একটা শৌখিন ছড়ি, তার মুন্ডিটা হাতির দাঁতের। দু'চোখেই লালচে ভাব, রাত্রি জাগরণের চিহ্ন প্রকট।

চেয়ারে বসে তিনি প্রথমে চারদিকটা দেখে নিলেন, তারপর আঙুল তুলে বললেন, এই হাবু, ইদিকে আয়। বারো-তেরো বছরের সেই ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে গেল তাঁর কাছে।

জমিদার বললেন, তোকে আমি একটা কথা জিগাব, ইস, তোর নাক দিয়ে সিকনি গড়াচ্ছে কেন? যা পরিষ্কার হয়ে আয়। অবহি তুরন্ত।

এরপর তিনি আর একটি ওই বয়েসের ছেলেকে ডাকলেন, এই ইদ্রিস, আয় এদিকে।

ইদ্রিস ইজেরের বদলে খাকি হাফপ্যান্ট পরা, তার ওপর ফতুয়া, অনেকটা সচ্ছলতার ছাপ আছে তার চোখেমুখে।

জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, ইদ্রিস, কাল দুপুরে তোদের ক্লাসে কী হয়েছিল রে? কীসের গন্ডগোল?

সে বলল, আমাদের অঙ্কের স্যার ওই হাবুকে একটা আঁক কষতে দিয়েছিলেন। হাবু তো সেটা পারেইনি, কীসব নাকি আজে বাজে ভুল করেছিল। তখন স্যার আমাকে বললেন, তুই হাবুর দুটো কান মুলে দে, একবার।

তুই তা দিলি?

জি, হুজুর। মাস্টার বলল...

হাবু এর মধ্যে নাক ঝেড়ে ফিরে এসেছে। সে উত্তেজিতভাবে বলল, একবার না, দু'বার।

কী রে, মাস্টার কী বলেছিল, একবার না দু'বার?

ইদ্রিস বলল, একবারই বলেছিল। এই হারামি হাবুটা এখন ঝুট বলছে।

জমিদার বললেন ঠিক আছে, একবার না দু'বার তাতে কিছু আসে যায় না। এখন তোদের আমি একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। ধাঁধা কাকে বলে জানিস তো। বেশ! এবার মনে কর ওই অঙ্কটা আর একবার কষে দেখা গেল, হাবুই ঠিকঠাক করেছে, গণেশ মাস্টারেরটাই ভুল। তা হলে কী হবে? হাবুকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সেটা ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। কানমলার শাস্তি কে ফিরিয়ে দেবে, ইদ্রিস না গণেশ মাস্টার?

সবাই একেবারে নিস্তব্ধ।

জমিদার মশাই আপন মনে হেসে উঠে বললেন, অনেকেই মনে মনে কী বলছে, তা আমি ঠিক বুঝতে পারি। তারা ভাবছে, কান মলার শাস্তি আবার কান মলা ফিরিয়ে দিলেই হয়। হাবু এবার কান মলে দিক, কাকে, ইদ্রিসকে! গণেশ মাস্টারকে এমন খোলাখুলি জায়গায় হেনস্থা করা উচিত হবে না। ইদ্রিসই এই শাস্তিটা মেনে নিক।

উঁহু, এটা ঠিক উত্তর হল না। কালকের কান মলার উত্তর আজকের কান মলা হতেই পারে না। কাল বিনা দোষে হাবুকে অপমান করা হয়েছে, সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে গেছে নিজের ঘরে। সারা রাত সে

ঘুমোতে পারেনি। সেই তুলনায় আজকের কান মলা তো খেলার মতন।

একজন, দাড়ি গোঁফে মুখ প্রায় ঢাকা, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর, আমি ইদ্রিসের বাবা, আমি আমার পোলাডাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ও আর এখানে থাকবে না।

জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, কেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও?

লোকটি বলল, ওর যথেষ্ট লেখাপড়া শেখা হয়েছে, আর দরকার নাই। ও বাড়িতে আমার সঙ্গেই থাকবে।

জমিদার তার মুখের কৌতূহলের হাসিটি না মুছে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করে বুঝলে যে, ওর লেখাপড়া যথেষ্ট শেখা হয়েছে? তোমার নিজের দৌড় কদ্দুর? ছেলে তো এখন পড়ে ছয় ক্লাসে, তুমি তার বেশি পড়েছিলে?

সেই লোকটি এবার খানিকটা রাগতভাবেই বলল, হুজুর, আমরা আপনার বান্দা। আমাদের বচপনকালে এই সারা তল্লাটে কোনও ইস্কুল দূরে থাক, কোনও মক্তব মাদ্রাসা, এমনকী কোনও পাঠশালাও ছিল না, কেউ আমাদের পড়াশুনা শেখার কথাও বলেনি।

জমিদার বললেন, সে সব তো আমার আগেকার লোকজনের ব্যাপার। সে দায়িত্ব আমি নিতেও পারি না, পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটিতে চাই না। এবার শোন ভাল করে। তোর ছেলেকে আমি এখান থেকে যেতে না দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখতে পারি। তোর বেয়াদবির জন্য তোর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে পারি, তাই না? জমিদারদের তো এই অধিকার থাকেই, কেউ বাধা দিতে সাহস পায় না। তবে, আমি আগুন-টাগুন পছন্দ করি না। তোর ছেলে যদি এই স্কুলে থেকেই ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়তে চায়, তাহলে তাকে সব রকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হবে। দৈবাৎ তোর ছেলে ম্যাট্রিকটা পাশ করে যদি কলেজে ভর্তি হতে চায়, তাও পাবে। একেবারে এম এ পড়া পর্যন্ত সে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক টোশাক, পড়ার খরচ সবই পাবে। তোর ছেলে যদি এসব না চায়, তোর সঙ্গেই চলে যেতে চায়, তাতেও আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি। সে ক্ষেত্রে সে এখানে আছে দেড় বছর, তার জন্য যা খরচ করা হয়েছে, সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

তিনি উর্ধ্বনেত্র হয়ে কিছুটা চিন্তা করে বললেন, বেশি হিসেব করার দরকার নেই। একান্ন টাকা দিলেই হবে। সেই টাকাটা জমা করে দিয়ে যাও, ছেলেকে নিয়ে যাও।

সেই লোকটা আঁতকে উঠে বলল, এত টাকা? সে আমি পাব কোথায় হুজুর।

জমিদার তাকে এবার ধমক দিয়ে বললেন, তোর সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়ে গেছে। এখন সরে যা।

তিনি আঙুল তুলে আর একটি ছেলেকে ডাকলেন, তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে তাঁর চোখ পড়ল মানিকের দিকে।

ভুরু কুঁচকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওই ছোঁড়াটা কে? নতুন দেখছি। ওকে কে এনেছে এখানে?

কেউ উত্তর দিল না।

তিনি আবার বললেন, কেউ ওই ছোঁড়াটাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় তো।

মানিক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, নিজেই সে এগিয়ে গেল জমিদারের দিকে। ঝপাং করে সে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে নিল।

জমিদার ওর আপাদমস্তকে চোখ বুলোলেন দু'বার।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথা থেকে আসছিস?

মানিক বলল, আজ্ঞে, আমাদের গ্রামের নাম চিতলমারি।

জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, বাপের নাম কী?

একটু ইতস্তত করে মানিক বলল, আজ্ঞে, ওঁর নাম আদিনাথ চৌধুরী।

জমিদার আবার একটু হাসলেন। তারপর বললেন, আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি। তোরই মতন কিছু নষ্ট ছেলে কিছু একটা গর্হিত কাজ করে ফেলে গ্রাম ছেড়ে পালায়, নিজেদের নামও বদলাইয়া ফেলে, কিন্তু বাপের নামের বদলে অন্য নাম বলতে পারে না। তা হলেই তো সে বেজন্মা হয়ে যাবে। ...আদিনাথ চৌধুরী, নামটা কেমন যেন শোনা শোনা মনে লয়। কী করেন তিনি?

মানিক বলল, আজ্ঞে সামান্য কিছু জমি আছে, আর যজমানি করেও কিছু উপার্জন হয়, কোনওরকমে..।

জমিদার বললেন, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। ওই আদিনাথ চৌধুরী নামে লোকটিকে গোখরো সাপ দংশন করেছিল, তখন সে ওই সাপটার সঙ্গে লড়াই শুরু করে, এমনকী যমরাজও এসে হেরে যায় তার কাছে। সেই চৌধুরীই তো?

মানিক বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই।

জমিদার বললেন, তুই কোন দুষ্কর্ম করে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছিস, সেটা আমি জানতে চাই না। কিন্তু তুই কোন মতলবে এই গ্রামে চলে এলি, সেটা তো আমাকে জানতেই হবে।

মানিক হাত জোড় করে বলল, হুজুর আমার কোনও মতলব নেই। আপনার এই ইস্কুলের কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। আপনি যদি আমাকে একটু স্থান দেন...আমি গত বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি, এ বছরেও সেই পরীক্ষায় বসতে চাই। যদি এখানকার শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাই।

জমিদার বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললেন, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারিসনি, তার মানে, তুই দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিস! তুই তো তাহলে রীতিমতন একজন বিদ্বান রে! আমার এখানে যে দু'জন মাস্টার পড়ায়, তাদের একজন পড়েছে ছয় ক্লাস, আর একজন আট ক্লাস। তাতেও আমার একটু সন্দেহ আছে। এখানে তোকে পড়াশুনায় সাহায্য করার মতন তো কেউ নাই। তবে একটা ব্যবস্থা হতে পারে, তুই ওই মাস্টার দুটোকে পড়াতে শুরু কর। সে জন্য তুই মাসে কিছু হাতখরচও পাবি।

মানিক তার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব করুণ করে বলল, না স্যার, আমি তো আপনার কাছে চাকরি চাইতে আসিনি। আমি এবার মন দিয়ে পড়াশুনো করে পরীক্ষা দিতে চাই।

জমিদার বললেন, ঠিক আছে, এখানে কিছু দিন থেকে যা। নিজেই

বুঝে দেখবি এখানে তোর কোনও সুবিধে হচ্ছে কি না। ওই ইস্কুলের জায়গাটাতে শুবি, আমি একটা ছাউনি বানিয়ে দেব।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমার এ ইস্কুলে ভর্তি হতে গেলে কিছু না কিছু পরীক্ষা দিতেই হয়। অগা-বগাদেরও দিতে হয়, যাতে তারা যে অগা-বগা, সেটাও জানতে হবে তো। তোকেও আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, শুধু একটা, তার উত্তর দিতে পারলেই তুই পাশ। তুই বাজখাঁই গলার কথা শুনেছিস কখনও?

মানিক মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল যে, শুনেছে।

জমিদার বললেন, কোনও লোকের খুব ভরাট গলা, তাতে গমগমে আওয়াজ হয়, তখনই লোকে বলে এ একেবারে বাজখাঁই গলা। এমনকী আমিও যখন গান গাই, তখনও লোকে বলে আমারও বাজখাঁই গলা। কেন বলে? ওই কথাটার আসল মানে কী?

মানিক বলল, হুজুর, আমার জ্ঞান-গম্যি খুবই কম। তবু কী করে যেন এই কথাটার মানে আমি জানি। বলব?

জমিদার বললেন, বলবিই তো। আমি সেটাই জানতে চাইছি।

মানিক বলল, এ দেশের উত্তরের দিকে একজন খুব নামকরা মুসলমান গায়ক ছিলেন, তাঁর নাম বাজ খাঁ। হয়তো নামটা অনেক লম্বা ছিল, লোকের মুখে মুখে সেটাই বাজ খাঁ হয়ে যায়। দারুণ জোরালো ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর যে, তিনি উদারা, মুদারা, তারায় এসে গমক দিলে নাকি পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠত। গাছের ডাল ভেঙে পড়ত, পুকুরের জলে জোয়ার-ভাটা খেলে যেত। আরও কত গল্প আছে। সেই জন্যই এখন কোনও গায়কের গলা সেরকম হয়—না, না, ঠিক সে রকম নয়, কাছাকাছি, সেই গায়কের সঙ্গে বাজ খাঁর তুলনা করা হয়। হুজুর এই তুলনা কিন্তু মোটেই নিন্দাসূচক নয়, বরং খুব প্রশংসার। একদিন আপনার গান শুনতে চাই।

জমিদার তার কুর্তার জেবে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট রেশমের পেটিকা বার করলেন, তার থেকে একটা রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে ছুড়ে দিলেন মানিকের গায়ে। তারপর তিনি বললেন, তুই পুরোপুরি ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিস, তার জন্যই তোকে এই ইনাম দিলাম। এবার তোর পাছায় দুই লাথি মেরে তোকে এখান থেকে তাড়াব।

মানিকের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে মিনমিন করে বলল, হুজুর আমি কী দোষ করেছি, কী ভুল করেছি?

জমিদার বললেন, তুই সঠিক উত্তর দিয়েছিস, কিন্তু প্রকাশ করতে পারিসনি। জমিদারের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেই সহবত জ্ঞান নেই তোর। জমিদার কিছু জিজ্ঞেস করলে তখুনি কি উত্তর দিতে হয়? মনে হয় তাতে যেন তুই জমিদারের চেয়ে বেশি বেশি জানিস। তোর কথা শুনে সবাই ভাবছে, তুই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস। এরপর তুই বেয়াদপের মতন আমাকে অপমান করতেও পারিস যেখানে সেখানে। পাজির পাঝাড়া, তোকে যে আমি এখনও খুন করিনি, সেটাই তোর সাত পুরুষের ভাগ্য। তুই আমার গান শুনতে চাস কোন সাহসে?

মানিক বলল, না হুজুর, এরকম কোনও কথাই আমার মাথায় আসেনি। আপনাকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, আর কোনও জমিদার...

জমিদার দু'হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, চুপ, চুপ। ওরে কে আছিস, এই দুখিরাম, আয় না এদিকে। এই ছোঁড়াটাকে মার দু'লাথ।

দুখিরাম একজন মোটা সোটা মানুষ, তার মুখটা দেখলেই বোঝা যায়, তার মাথার মধ্যে অনেকটাই খালি। সে ক্যাৎ ক্যাৎ করে দু'খানা বেশ জোর লাথি কষাল মানিকের পশ্চাৎদেশে।

তার মারার ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল, সে শুধু জমিদারের আদেশেই এই শাস্তি দিচ্ছে না, মানিকের ওপর তার নিজেরও কিছু রাগ আছে। অথচ মানিক আগে কখনও এই লোকটিকে দেখেইনি।

জমিদার বললেন, যাঃ, এবার ফোট্। আমি চাই, আজ দুপুরের মধ্যেই তুই এই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাবি। নইলে কিন্তু তোর গর্দানটা আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

মানিক খুব আশা করেছিল, এই সহৃদয় জমিদারের কাছে আশ্রয় পেলে সে কয়েকটা দিন অন্তত শান্তিতে কাটাতে পারবে। প্রথম দিকে জমিদারের ব্যবহার দেখে মনে হয়েছিল সেরকমই সব ঘটবে। হঠাৎ কী করে সব পাল্টি খেয়ে গেল। এ রহস্য বোঝার সাধ্য নেই মানিকের।

মানিক হাঁটতে শুরু করার পরই নামল বৃষ্টি। সে বৃষ্টি আর থামেই না। এরকম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেশিক্ষণ হাঁটাও খুব শক্ত। কোথাও কোথাও রাস্তায় জল জমে গেছে হাঁটু পর্যন্ত।

এরকম বৃষ্টির সময় রাস্তায় মানুষজনও থাকে না বিশেষ। তবু সে ক্লান্ত হয়ে কোথাও একটু থামলেই যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠে আসছে একজন মানুষ। সে ধমক দিয়ে বলছে, এই থামলি কেন? যা, যা, এই দুপুরের মধ্যে...

মানিক যতদূর সম্ভব মনের জোর সংগ্রহ করে হেঁটেই চলল। এই গ্রামের সীমানা কোথায়, আর কতদূর যেতে হবে, তাও সে জানে না। তাকে শুধু সামনে যেতে হবে।

তবু এক সময় মানিকের উরু দুটি ভারী হয়ে আসে, ব্যথা বোধ করে কাঁধে, বুকের মধ্যে শুরু হয় ধড়ফড়ানি। কপালে জ্বলতে থাকে জ্বর। নিজের অজান্তেই সে এক জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

মানিক সেখানে, সেই অবস্থাতেই পড়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে নিমুনিয়া কিংবা ব্রঙ্কাইটিসে ভোগার অবস্থাও এগিয়ে আসতে লাগল কাছে। কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর সে একবার চোখ মেলছে, একটু পরেই আবার চলে যাচ্ছে ঘুমের জগতে।

মানিক যেখানে পড়ে আছে, তার কাছাকাছিই রয়েছে একটা ছোট, পাকা বাড়ি। এটাই এখানকার জমিদারের প্রমোদ ভবন। সন্ধের পরই তিনি শুরু করেন মদ্যপান, তারপর নেশাটি কিছুটা গাঢ় হলেই তিনি দেখতে চান সেখানে অনেক স্বাস্থ্যবতী মেয়ের উলঙ্গ নৃত্য। আর ওখান থেকে শোনা যায়, নানা রকম চিৎকার ও শীৎকার। মানিক একবার জেগে উঠে সেসব আওয়াজ শুনলেও তার মর্মে ঢুকল না কিছুই।

তারপর এক সময়, তখন ঠিক কত রাত কে জানে, রাত্তিরের তৃতীয় প্রহর হবে বলেই মনে হয়, আগাগোড়া কালো পোশাক পরা এক দৈত্যাকৃতি মানুষ এসে মানিককে পা দিয়ে একবার ঠেলা দিয়ে বলল, এই, ওঠ, তোকে এক জায়গায় যেতে হবে। ওঠ।

এখানে সন্ধের পর দু'তিনজন জমিদারের পেয়ারের লোক ছাড়া অন্য কারওর আসা নিষেধ। শোনা যায়, জমিদারের মা একদিন এসে পড়েছিলেন, সে জন্য তাঁকেও গুনাগার দিতে হয়েছিল।

জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, এখন মানিকের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সম্ভবত সেটা বুঝতে পেরেই সেই আগন্তুক নিচু হয়ে মানিকের একটা হাত ধরে টেনে তুলল, তারপর একটা জোর ঝাঁকুনি দিল। তাতেই যেন মাথার মধ্যে কিছুটা ভোর হয়ে এল মানিকের।

আগন্তুক মানিকের হাত ধরে টেনে টেনে নিয়ে এল একটা জায়গায়। সেখানে রয়েছে একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহীই এখানকার জমিদার।

অশ্বারোহী কিছুটা জড়ানো গলায় বললেন, কী রে মাইনকা, তুই এখনও বাঁইচ্যা আছস? বেশ বেশ। আর দুই-তিন দিন থাকলেই তোর দেহ আর মুন্ডুটা আলাদা হয়ে যেত। আমি সেরকমই খবর পেয়েছি। এখানে যে কত দলাদলি হয়, তুই পোলাপান, তা বোধ করি ঠিক জানিস না। এর মধ্যেই একটা দল তোকে শত্রু ভাবতে শুরু করেছে। তুই নাকি গুপ্তচর, স্পাই। কিন্তু আমি তো জানি, তোর মতন ল্যাদারা মার্কা ছেলের পক্ষে স্পাই হওয়া সম্ভব নয়। স্পাই হতে গেলে আগে ট্রেনিং নিতে হয়। তাতেও অনেকে যোগ্য হতে পারে না। ওরে মানিক, মানুষ খুন করতে এদের চোখের একটা পাতাও কাঁপে না।

মানিক ভ্যাবাচ্যাকা ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, সকালবেলা যে-জমিদার তার সঙ্গে অত খারাপ ব্যবহার করলেন, তিনিই আবার ফিরে এসেছেন। তাকে সাহায্য করতে, না আরও কিছু শাস্তি দিতে!

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে, জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, বুঝতে পারলি আমার কথা?

মানিক এবার বলল, হুজুর, আপনি বলেছিলেন, আজই দিনমানের

মধ্যে আমাকে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ গ্রামের সীমানা কোথায় তা আমি বুঝতে পারিনি। তবে চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। এখনও যদি কেউ আমাকে পথ বাতলে দেয়, তা হলে আমি...

জমিদার বললেন, এখন আর অন্য গ্রামে গেলেও তুই নিষ্কৃতি পাবি না। সারা দেশেই এখন ক্ষমতা দখলের জন্য তোলপাড় চলছে। তাই খুন-জখম এখন জলভাত। এখানকার খুনিদের সঙ্গে অন্য জায়গার খুনিদের যোগাযোগ থাকে। শোন, তোকে যা করতে হবে এখন মন দিয়ে শোন। তুই যে-কোনও উপায়ে ক্যানিং চলে যা। সেখানে এইরকম অবস্থার মধ্যে পৌঁছনো সহজ ব্যাপার নয়। অনেক বিপদ হতে পারে পথে। যদি কোনওক্রমে ক্যানিং পৌঁছতে পারিস, তা হলে তুই এ যাত্রায় বেঁচে যাবি। আমি তোর জন্য একটা চিঠি এনেছি। সেখানে আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধু থাকে। খুবই শক্ত ধরনের মানুষ, কারওকেই সে তোয়াক্কা করে না। তাকে আমার এই চিঠিখানা দেখাবি। তাহলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তোকে আশ্রয় দেবে। যত্ন করবে। সেখানে আর কেউ ট্যাঁ ফোঁ করার সাহস পাবে না। এটাই তোর বাঁচার একমাত্র উপায়।

কিছু একটা বলতে গিয়েও মানিক পারল না। পায়ের জোর নেই বলেই সে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল।

জমিদার বললেন, আরে আরে, ছেলেটার কী হল? এই, তোরা কেউ দ্যাখ তো।

সেই আগের লোকটিই মানিকের হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল।

মানিক খুব জোরে দু'বার মাথা ঝাঁকাল, তারপর বলল, না, না আমার কিছু হয়নি, আমি ঠিক আছি, ঠিক আছি। হঠাৎ একটু মাথাটা...হুজুর, আপনি সকালবেলা বলেছিলেন, আমার মুখও আপনি দেখতে চান না। আবার এত রাতে আপনি আমার প্রাণ বাঁচাতে...

জমিদার উচ্চহাস্য করে বললেন, কেন আমি তোর সঙ্গে ওইরকম ব্যবহার করেছি, তা তুই বুঝতে পারিসনি। এখানকার আট দশটা গ্রামের মোড়লরা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি যে ইস্কুলটা চালাই সেটা ওরা সহ্য করতে পারে না একেবারে। আমাকে মারার জন্য তারা তক্কে তক্কে থাকে। তবে আমার সঙ্গে যে সবসময় এই অস্ত্রটা থাকে, তাও ওরা জানে।

তিনি একটা রিভলবার তুলে দেখালেন।

তারপর বললেন, মোদ্দা কথাটা হল, এখন কেউই বাইরের কোনও অচেনা মানুষকে গ্রামে স্থান দিতে চায় না। আমি যদি তোর সঙ্গে আরও দহরম মহরম করতাম, তাহলে ওরা ধরেই নিত যে, আমি তোর সঙ্গে মিলে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছি। তাতে তোর বিপদ আরও বেড়ে যেত। তাই তো আমি ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে লাথি মেরে তাড়ালাম। সব তো গাধার দল। কোনও কিছুই তলিয়ে ভাবার ক্ষমতা নেই। তুই যাত্রা শুরু কর।

মানিক বলল, হুজুর, আমাকে বাঁচাবার জন্য আপনি এত কিছু চিন্তা করেছেন, আমি সারাজীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম।

জমিদার বললেন, কার সারাজীবন, তোর না আমার? এমনও হতে পারে, তোর আয়ু আছে দিন সাতেক, কিংবা আমার আয়ু ফুরিয়েই গেছে। ওসব গোলাম-টোলামের কথা বাদ দে। তুই এখন পালা, পালা! এই নে চিঠিটা।

তার যে সারা শরীর জ্বরে পুড়ছে, হাঁটার ক্ষমতাই নেই, সে কথা জানাল না মানিক। সে জমিদারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, মাতালের মতন টলতে টলতে এগোতে লাগল।

তিন

মাতলা নদীর ধারে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানিক। ম্লান মুখে।

কাছেই মানুষদের বসবার জন্য একটা বেঞ্চি ছিল, এখনও তার লোহার ফ্রেমটা ঠিক আছে, কিন্তু মাঝখানের তক্তাটা উধাও।

ক্যানিং পৌঁছতে তার লেগেছে এগারো দিন। সারা পথটাতেই বিপদ-আপদ তার সঙ্গী হয়ে ছিল। এক একদিন তার কোনও খাদ্যই জোটেনি, এক একদিন খেতে হয়েছে মার। যাই হোক, তাতে তার কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়নি। শুধু একবারই হয়েছে তার জীবনের পরম ক্ষতি।

গ্রামগুলি পেরিয়ে আসার সময় দিবাভাগে যতদূর সম্ভব লোকজনের দৃষ্টি থেকে সে আড়ালে থেকেছে, লুকিয়েছে বনে-জঙ্গলে। শরীর খুব দুর্বল বলে সে একসঙ্গে বেশিদূর যেতে পারেনি, বারে বারেই থামতে হয়েছে। রাত্তিরবেলা হাঁটাই নিরাপদ, তাই সে ঘুমিয়েছে দিনে দিনে। আশানুর নামে গ্রামটার কবরখানায় সে শুয়েছিল একটা গর্তের মধ্যে, জেগে উঠেই সে দেখতে পেল, তার টাকা ও গয়নার ছোট পুঁটুলিটা নেই। ঘুমের মধ্যে [illegible] কোথাও পড়ে গেছে? সে পাগলের মতন খুঁজতে লাগল। নেই তো নেই-ই। কেউ সেটা তুলে নিয়ে গেছে।

যখন মানিক বুঝতে পারল যে, সেটা আর পাওয়া যাবে না, তখন সে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করেছিল। কিছুতেই সে কান্না সে থামাতে পারে না। একসময় আট দশটা বাচ্চা ছেলে এসে গর্তের মধ্যে কান্নার আওয়াজ শুনে উঁকি মারল সেখানে। মানিককে তারা ভূত-প্রেত না পাগল ভাবল কে জানে, তারা ইট-পাটকেল ছুড়ে মারতে লাগল তার দিকে। সেখানেই মানিকের মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু হঠাৎ যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে সেই বাচ্চারা চ্যাঁচামেচি করে পালিয়েও গেল।

মানিক এর পরে ওপরে উঠে এসেও কিছু দেখতে পেল না। সে তার সর্বস্ব হারিয়েছে। শুধু জমিদারবাবুর চিঠিখানা রয়ে গেছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনওরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছেছে ক্যানিং-এ।

গুণবন্ত সিংহকে বেশি খুঁজতেও হল না। রাস্তায় একজন পুলিশকে দেখে তার কাছে গিয়ে ওর নাম করতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে দিল একটা বাড়ি।

সে বাড়িটি একটা বিরাট হাভেলির মতন। তার মধ্যে অনেক মানুষের বাস। একটা মূল বাড়ির আশেপাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ি। অনেক লোক সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। সবাই যেন

খুব ব্যস্ত।

গেটের কাছে এক দীর্ঘদেহী দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক কথা বলছে অন্য একজনের সঙ্গে। তার কোমরে ঝুলছে কৃপাণ, হাতে রয়েছে বালা, আর মাথার ঘন চুলে একটা ছোট কাঠের চিরুনি গোঁজা।

মানিক এসে সেখানে দাঁড়াল। কেউ যখন অন্য কারওর সঙ্গে কথা বলে, তখন মাঝখানে এসে নিজের কথা বলাটা যে অভদ্রতা, সে জ্ঞান আছে মানিকের।

একটু পরে, সেই পাঞ্জাবিটি মানিকের দিকে চাইতেই মানিক জমিদারের চিঠিটা এগিয়ে দিল তার দিকে।

বাংলায় লেখা সেই চিঠি দু'বার পড়ল সে। তারপর মানিকের সারা শরীরের দিকে দেখল, একটা হাত রাখল মানিকের কপালে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, ওরেঃ, বাপ রে বাপ। তোমার যা শরীরের অবস্থা দেখছি, তুমি কি আমার এখানে মরবার জন্য এসেছ, নাকি এখনও বাঁচতে চাও?

এক পৃথিবী ভর্তি কাতরতা সঙ্গে নিয়ে মানিক দুর্বল গলায় বলল, হুজুর আমি এখনই মরে যেতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই।

গুণবন্ত সিংহ বলল, আমি বাপু ডাক্তার-ফাক্তার নই। তবে আমি মানুষের অসুখ-বিসুখ দেখে বুঝতে পারি। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা এখন খুব শক্ত। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। আমি একজন ভাল অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারকে ডেকে আনব। তার আগে আমার সব কথা তোমাকে মেনে চলতে হবে। মানবে তো?

মানিক বলল, অবশ্যই হুজুর। আপনি যা বলবেন।

গুণবন্ত বলল, আমাকে হুজুর-টুজুর বলার দরকার নেই। আমাকে গুণবন্তজি বলে ডাকতে পার। শোনো, ওই যে হলুদ রঙের বাড়িটা দেখছ, সেখানে একটা ঘরে দেখবে, দু'খানা বিছানা পাতা আছে। তার একটাতে মাথার বালিশ আছে, অন্যটাতে নেই। যেটায় বালিশ নেই, তুমি সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে। আর একদম ওঠা-হাঁটা করবে না। বাইরে তো বেরোবেই না। তোমার খাবার-দাবার ঘরেই পৌঁছে যাবে। যাও—

মানিক হাঁটতে শুরু করতেই সে আবার বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার জামা-কাপড় তো কাদা লেগে কুচ্ছিৎ হয়ে গেছে। তোমার সারা শরীরেও কাদা। এ নিয়ে তুমি বিছানায় শোবে কী করে? আর কোনও বদলি জামা কাপড় আননি?

মানিক ক্লান্তভাবে বলল, এনেছিলাম তো। রাস্তায় সব চুরি হয়ে গেছে।

গুণবন্ত বলল, তাও তো তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি চোরের পাল্লায় পড়েছিলে। ডাকাতদের পাল্লায় পড়লে তুমি তোমার মুন্ডুটা সঙ্গে নিয়ে এখানে পৌঁছতে পারতে না। এখানে আর তোমার কোনও ভয় নেই।

পাশের লোকটিকে সে বলল, দেশের প্রধান সংকট কখন দেখা যায় জানেন তো, যখন সাধারণ মানুষও খুন জখমে মেতে ওঠে, রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে চায়। যেমন একবার গুজরাতে হয়েছিল।

সেই লোকটি মাথা নেড়ে আলগাভাবে বলল, হ্যাঁ, তা তো হয়ই।

অদূরে একটি অল্পবয়সি ছেলেকে দেখতে পেয়ে গুণবন্ত চেঁচিয়ে বলল, এ লেড়কে, ইধার আ। শুন!

ছেলেটির বয়স বারো-চোদ্দো হবে। খালি গা, নেংটিতে একটা বাঁশি গোজা রয়েছে, সম্ভবত সে এখানকার রাখাল-টাখাল হবে।

সে কাছে আসবার পর, গুণবন্ত তাকে বলল, এই লোকটি আমাদের অতিথি। অতিথি কাকে বলে জানিস তো? (ছেলেটি মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে জানে) বেশ, এর জন্য তুই একটা লুঙ্গি আর একটা কামিজ চেয়ে নিয়ে আয় মালকানির কাছ থেকে। ওই হলুদ বাড়িটাতে ও থাকবে, বাড়ির পিছন দিকে একটা কুঁয়া আছে। ওর হাত-পা ধোওয়ার জন্য সেটা দেখিয়ে দিবি। এখন যা।

ছেলেটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মানিকের মনে এমন অনুভূতি হল যাকে অভিভূত বললেও কম বলা হয়। কোনও মানুষের কাছ থেকে এমন সহৃদয় সাহায্য পাবে, তা সে কখনও কল্পনাও করেনি। কিছু কিছু মানুষ যেমন সাঙ্ঘাতিক হিংস্র হয়, আবার কিছু মানুষ বিনা স্বার্থেই কোনও অসহায় মানুষের সেবা করে।

এর পর তিনদিন তার বিছানা ছেড়ে ওঠারই ক্ষমতা রইল না। তার কী যে অসুখ হয়েছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। শুধু বৃষ্টিতে ভিজলে কি এমন হয়? সে আর নাও বাঁচতে পারে?

এর মধ্যে একজন চিকিৎসক এসে তাকে দেখে গেছেন দু'বার। গুণবন্ত প্রত্যেক দিন খবর নিতে আসে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর সেই রাখালটি যার নাম কদু, সে সারাদিন বসে থাকে দরজার কাছে।

মানিক শেষ পর্যন্ত বেঁচেই গেল।

এক সময় পুরো জ্ঞান ফিরে আসার পর মানিক ভুগতে লাগল অন্য এক দুশ্চিন্তায়।

এখানে সে কতদিন থাকতে পারবে, সে বিষয়ে গুণবন্ত কিছুই জানায়নি। সে খাদ্য-পানীয় নিয়মিতই পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় দিনের পর দিন থাকতে হলে তার নিজেরই তো লজ্জা হবে।

এখানে সারাদিনই খুব হই-হল্লা চলে, কাজের হই-হল্লা, প্রায়ই শোনা যায় হাসির শব্দ। পড়াশুনোর কোনও পরিবেশই নেই। তাছাড়া, মানিকের সব বই-পত্রও তো নিয়ে গেছে চোরে। কিংবা চোর ওই সব চায়নি, অতখানি রাস্তা জল ঠেলে আসতে সে সব পড়ে যেতেও পারে। তখন মানিক একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, সব কথা তার মনেও পড়ে না।

শেষ পর্যন্ত কি একটা ছোটখাটো কাজ জুটিয়ে এখানেই তাকে থেকে যেতে হবে সারাজীবন? এই জন্য সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল?

শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও মনের কষ্ট বেশি তীব্র হয়।

চোখ না বুজলেও মানিক মাঝে মাঝে দেখে শুধু অন্ধকার। তারপর সেই অন্ধকারে কিছু না কিছুর আকার নেয়। কখনও মনে হয়, কালো রঙের একটা বিশাল হিংস্র ভাল্লুক থপথপ করে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

প্রথম কয়েকদিন সে কী খেয়েছে, কে তার খাবার এনে দিয়েছে, এসব কিছুই মনে নেই মানিকের। চৈতন্য পুরোপুরি ফিরে আসার পর সে একদিন দেখল, কদুর সঙ্গে একটি মেয়ে ঘরে এল, তার হাতে একটা কাঁসার থালায় এনেছে কিছু খাদ্য।

মেয়েটিকে মনে হয়, প্রায় তারই বয়সি, মুখখানা গোল ধরনের, চিবুকে একটা আঁচিল।

মানিককে তার বিছানায় উঠে বসে থাকতে দেখে সে বলল, কী গো ঠাকুর। আজ দিব্যি চোখ মেলে আছ দেখছি। আজ তুমি নিজেই খেতে পারবে, না খাইয়ে দেব? এই দ্যাখো ভাত আর ঝিঙের সবজি, আছে কয়েকটি তালের বড়া, আমি নিজেই তোমার জন্য বানিয়েছি। খেয়ে দেখো, যদি ভাল লাগে, আরও পাবে।

মানিক সবটা না শুনে উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

মেয়েটি বলল, আমার নাম? তা জেনে তোমার কী হবে, তাতে কি তোমার খিদে বাড়বে?

মানিক বলল, খিদে? কী জানি। তোমাকে ডাকতে হলে, তোমার নাম...

মেয়েটি বলল, আমিও তো তোমার নাম জানি না।

মানিক বলল আমার নাম...আমার নাম...ইয়ে, দ্বিজেন্দ্র, না না, হরি নারান, না, তাও বোধহয় না, আমার নাম...

মানিকের সারা শরীর ভয়ে কাঁপুনিতে কেঁপে উঠল একবার। সে কি নামটাও ভুলে গেছে? তা হলে তার পরিচয়ই বা কী হবে?

সে বিড়বিড় করতে লাগল, আমার বাবার নাম আদিনাথ চৌধুরী, আমার দাদার নাম দ্বিজেন্দ্র, আর এক দাদার নাম হরিনারান। না, তা তো নয়, সেই দাদার নাম তো বংশীধারী, তাহলে আমার নাম, আমার নাম...

কদু বলল, আমার এই দিদিটার নাম নারী। সবাই ওই নামেই ডাকে। আর তোমার নাম তো মানিক!

একটা দুর্লভ, মূল্যবান রত্ন কুড়িয়ে পাবার মতন আনন্দে আবার

কেঁপে উঠল মানিক।

কদুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, ঠিক বলেছিস, আমার নাম মানিক, হ্যাঁ, মানিকই তো। কিন্তু এর নাম, শুধু নারী নাম হয় না কি?

নারী বলল, আমার বোধহয় একটা ভাল নামও ছিল, আমার মা গোয়ালঘরে আছাড় খেয়ে মরেই গেল, কিন্তু যাবার আগে সেই ভাল নামটা অন্য কারওকে বলে যায়নি। আমারও আর মনে নেই। চুকে গেল ঝামেলা। দুটো নাম থাকাটার দরকারই বা কী?

মানিক একটা তালের বড়া খেয়ে দেখল, বেশ সুস্বাদু।

কদু টপ করে একটা বড়া তুলে নিয়ে বলল, আমিও একটা খাই?

বেড়াল তাড়াবার ভঙ্গিতে নারী হাত নেড়ে নেড়ে বলল, এই, সরে যা। সরে যা! তুই তো সকালবেলাতেই অনেকগুলো পেঁদিয়েছিস।

প্রথম দিন গুণবন্তের সঙ্গে কথা বলার সময়ই মানিক লক্ষ করেছিল যে, এখানকার লোক বাংলায় কথা বললেও কিছুটা অন্যরকম। কিছু কথার মানেও বোঝা যায় না, পেঁদিয়েছিস-এর মানেটাই বা কি?

নারী নামের এই কিশোরীটি পরে আছে একটা লম্বা সেমিজ, বুকের কাছটায় এক টুকরো আলাদা কাপড় জড়ানো। বয়স বা শরীরের তুলনায় তার স্তন দুটি বেশ বড়।

একটা বয়স থেকে মানিকের লিঙ্গের উত্থান শুরু হয়। তারপর যখন তখন সেটি খাড়া হয়ে ওঠে। আবার কখনও একটা নাম শুনলে, যেমন উর্বশী, শুনলেই মানিকের চোখে ভেসে ওঠে এক নৃত্যরতা উলঙ্গিনীর দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে তার ওই অঙ্গটি শুধু খাড়া হয়ে ওঠে না, লোহার মতন শক্ত হয়ে যায়।

এই কিশোরীটি তেমন কিছু সুন্দরী-টুন্দরী নয়, মোটামুটি চলনসই বলা যায়। রং ফরসা নয়, তবু মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য আছে, তার পূর্ণাঙ্গ স্তন দুটির দিকে মানিকের চোখ চলে যাচ্ছে, কিন্তু তার শরীরে একটুও শিহরণ জাগছে না। সেই অঙ্গটি নেতিয়ে পড়ে আছে।

মানুষের যৌবন উদগমনের প্রথম দিকে হঠাৎ তার ক্ষুধা খুব বেড়ে যায়। অনেক রকম ক্ষুধা, তার মধ্যে যৌন ক্ষুধাও আছে। এই সময় অনেক নারীকে দেখলেই পুরুষদের কিছু না কিছু উত্তেজনা বা শিহরণ হয়। তাহলেও কোনও সভ্য মানুষ সামনের নারীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কিছু কিছু অসভ্য মানুষ অনেক সময় এরকম করে। এরা সংখ্যায় খুব কম হলেও, তাদের দাপট বেশি।

সভ্যতা আমাদের শেখায় সংযত হতে, আমাদের কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্য কোনও সৃষ্টিমূলক কাজে নিযুক্ত হতে। এই অনুভূতিতেই কিছু কিছু মানুষ কবিতা লিখতে শুরু করে, গান রচনা করে। কেউ বা ছবি আঁকতে চায়, গায়ক হয়ে ওঠে। আবার কিছু মানুষ এ সব কিছুই করে না। শুধু দেখে। আরও কিছু মানুষ এসব দেখেও না। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আর অসভ্য মানুষেরা এই ধারাবাহিকতায় আঘাত দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চায়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই দুই গোষ্ঠীর লড়াই অনবরত চলে আসছে। যুগে যুগে সভ্যতার অনুরক্তরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

মানিক যে ঠিক এই কথাই ভাবছিল, তা হয়তো নয়। তবে বাল্যকাল থেকে সে সভ্যতার সংস্পর্শে বেড়ে উঠেছে। এমনকী, তার অজ্ঞাতসারেই এই সভ্যতার ছায়া সবসময় তাকে অনুসরণ করে।

এখন সে শুধু ভাবছে, আর কোনওদিন কি সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন সে ফিরে পাবে?

তবে, এই কদু আর নারী যখন আসে, তখন কিছু সময় ওদের সঙ্গে লঘু কথাবার্তা বলতে তার ভালই লাগে। ওদের মুখ থেকে সে এখানকার নানারকম ঘটনা জেনে যায়। ওদের কাছে গুণবন্ত সিংহ যেন এক দেবতার মতন। সে কতরকম মানুষকে সাহায্য করে কিন্তু পুলিশ বা সরকারি লোকদের একটুও ভয় পায় না।

দু'তিনদিন পর, সন্ধেবেলা মানিক বসে আছে তার খাটে, পা ঝুলছে বাইরে। মেঝেতে বসেছে কদু আর নারী। ওরা দু'জনে মিলে একটা অতিকায় কচ্ছপের গল্প শোনাচ্ছে। সে কচ্ছপটি নাকি প্রায় একটা হাতির মতন প্রকাণ্ড, তার বয়সের কোনও গাছ-পাথর নেই। সে থাকে সরকারি দিঘিতে, মাঝে মাঝে উঠেও আসে ওপরে। এই তো গত শনিবারই তাকে দেখা গিয়েছিল। তখন গেটের কাছে আমাদের মালিকের সঙ্গে একটা পুলিশের সঙ্গে কী নিয়ে যেন তর্কাতর্কি চলছিল, কচ্ছপটা সেখানে এসে থামল। তারপর পুলিশটার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে আঁতকে উঠে দৌড়ে পালাল। এই কচ্ছপ সবসময় গুণবন্ত সিংহকে সাহায্য করে। ওর চোখে কী যেন আছে, অনেকেই তা সহ্য করতে পারে না।

মানিকের হঠাৎ মনে পড়ল, হিন্দুদের শাস্ত্রে বিষ্ণুর কূর্মাবতারের কথা আছে না? বিষ্ণু একবার মাছ হয়েছিলেন, একবার কচ্ছপ। বিষ্ণুর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

এরা কি সেই গল্পটা জানে? ওদের গল্পটা শোনাতে গিয়েও থেমে গেল মানিক। এরা তো গল্পটাকে গল্প বলে মানবে না, তাদের বিশ্বাসে আর একটা অবতারের নাম যুক্ত হবে। থাক তবে। বেশির ভাগ মানুষই কিছু না কিছু বিশ্বাস করতে চায়, তাই পৃথিবীতে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা এত কম।

সে শুধু বলল, কচ্ছপদের একটা ভাল নাম আছে, তা কি জান তোমরা?

দু'জনেই জানাল যে, তারা সেরকম নাম কখনও শোনেনি।

মানিক বলল, কূর্ম। এই নামটা মনে রেখো, তাহলে আরও গল্প জানতে পারবে।

কদু আর নারী এ ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাল না।

নারী হঠাৎ কদুর দিকে ফিরে বলল, কদু ভাইটি, লক্ষ্মী আর সোনা, তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবি? ঠাকুরের সঙ্গে আমার একটা অন্য কথা আছে।

কদু ফুঁসে উঠে বলল, কী এমন কথা, যা আমি জানতে পারি না?

নারী বলল, তুই নিশ্চয়ই জানবি। আমি তোকেও জানাব একটু পরে।

কদু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তবে, আর যাই-ই বলো, এখান থেকে পালাবার কথা যেন বোলো না। তাহলে

আমি মালিকের কাছে জানায়ে দিতে বাইধ্য হব।

কদু চলে যাবার পর একটুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল মানিকের দিকে। অন্যসময় এই মেয়েটি বেশ হাসি-খুশি ফুর্তির মুখে থাকে। এখন তার মুখটি আস্তে আস্তে করুণ হয়ে এল।

খানিক পরে সে বলল, ওই হারামজাদাটা কী করে বুঝল, কে জানে! ঠাকুর তোমার কাছে একটাই প্রার্থনা। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

হঠাৎ আগুন ছোঁয়ার মতন চমকে উঠে মানিক বলল, তোমাকে নিয়ে সঙ্গে যাব? কোথায়? আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।

নারী বলল, হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছ। আর কয়েকদিনের মধ্যেই। আমি জানি।

মানিক বলল, এরকম কথা তো আমি ভাবিওনি। তুমি জানলে কী করে?

নারী বলল, আমি হাত দেখতে জানি। তুমি যখন অজ্ঞান ছিলে, আমি তোমার হাত দেখেছি। তোমার এখানে থাকার কথাই নেই। আছে অন্য একটা বড় শহরে।

মানিক বলল, হাতের রেখায় এ সব জানা যায় কি না তা আমি বুঝি না। আচ্ছা ধরো, আমি এখান থেকে চলে গেলাম। কিন্তু কোথায় যাব? এ দুনিয়ায় আমার কোনও থাকার জায়গা নেই। কোথায় গিয়ে থামব, তাও জানি না। হয়তো আমাকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। সেখানে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কী করব?

নারী বলল, আমিও ভিক্ষে করব তোমার সঙ্গে।

মানিক বলল, তাই-ই বা কী করে সম্ভব? তোমার বয়স যদি অনেক বছর কম হত, ধরো ছয়-সাত, তাহলে আমরা বাবা আর মেয়ে সেজে, কিংবা দুই ভাই বোন, ভিখিরি সেজে পথে বেরোলে কেউ কিছু সন্দেহ করত না। কিন্তু এখন তুমি প্রায় আমারই কাছাকাছি, এখন তোমাকেই দেখবে সবাই, আমার কথা কেউ গ্রাহ্যই করবে না। কেউ যদি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তাদের একজনকেও তো বাধা দেবার তাগত আমার নেই। তারা হয়তো আগেই আমাকে মেরে ফেলবে। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তাছাড়া এখানে দিব্যি আনন্দে আছি, বাইরের বিপদের মধ্যে পড়তে যাবই বা কেন? আমি এত আহাম্মক নই।

নারী বলল, তবু তোমাকে চলে যেতেই হবে, তা আমি ভাল করেই জানি, ঠাকুর। সেদিন আমি অন্যরকম সাজ করে এসেছি। তুমি যদি তোমার ছায়ায় ছায়ায় আমাকে এই রাজ্যটা পার করে দিতে পার, তাতেই আমি...তোমাকে আর কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না।

মানিক জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন এই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে চাও, তাই আমি এখনও বুঝলাম না। এখানে তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নারী বলল, তুমি আমাকে নীলমণির হাটে নিয়ে যেতে পার? সেখানে খুব বড় হাট হয়, এখনও মানুষ বিক্রি হয়। তুমি সেখানে আমাকে বিক্রি করে দিতে পার। কিছু টাকা পাবে, তাতে তোমার অনেক সুবিধে হবে।

এবার শুধু বিস্মিত নয়, স্তম্ভিত হয়ে গেল মানিক।

সে আহত মানুষের মতো গলায় বলল, এ কী বলছ তুমি, নারী? আমি তোমাকে বিক্রি করে দেব? আমি কি সেই ধরনের মানুষ? আমার সঙ্গে কয়েকদিন মিশেও আমাকে এই চিনলে? ছি ছি ছি ছি! তোমাকে যদি অন্য কেউ বিক্রি করার চেষ্টা করে, আমি যদি তা রুখতে না পারি, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। নারী, সত্যি করে বলো তো, তুমি কেন ক্রীতদাসী হবার কথা বললে? সে যে কী অসহ্য, নোংরা জীবন, তা তুমি জান না?

নারী বলল, ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি না হলেও যে কত মেয়ে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় থাকে, তা বোধহয় তুমিও জান না। আমার বাবা-মা কেউ নেই। আমার জ্যাঠা একদিন আমাকে এখানে এসে ফেলে রেখে গিয়েছিল। এখন আমি বড় হয়েছি, এখন সব কিছুর জন্যই আমাকে মূল্য ধরে দিতে হয়, এখানে তিনজন মানুষ, না না, ঠাকুর, তোমাকে এসব শোনাতে চাই না। তুমি বড়ই সরল আর ছেলেমানুষের মতন। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি শক্ত। এর মধ্যে একদিন...

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজায় দুম দুম শব্দ হল।

নারী দৌড়ে গিয়ে খুলে দিতেই দেখা গেল, কদুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গুণবন্ত সিংহ। তাকে দেখেই নারী অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। গুণবন্ত একবার তার দিকে তাকাল। কোনও মন্তব্য করল না।

ঘরের মধ্যে এসে গুণবন্ত বলল, মানিকবাবু, আমি এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমাকে একবার দেখে যাই। তুমি তো বেশ ভালই আছ মনে হচ্ছে। ব্যথা-বেদনা আছে কিছু?

মানিক বলল, না, সিংজি, আমি ভালই আছি। ব্যথা-বেদনাও নেই। আমাকে আর কতদিন ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে হবে? আপনার কাজে কিছু সাহায্য করতে চাই।

গুণবন্ত বলল, সেটাই হচ্ছে কথা। তোমাকে আগে একটা ভাল খবর দিই। এই শহরে গত দু'দিন কোনও খুনোখুনি, কাটা-কাটি হয়নি। সেসব এখন চলছে শরিয়তপুরে। তার মানে কী জান, এখন বেশ কিছুদিন আমরা এখানে শান্তিতে থাকব। তোমার চিকিৎসকও বললেন, তোমার রোগের লক্ষণ সব কমে যাচ্ছে। তবে তুমি যদি সর্বক্ষণ ঘরে বসে থাক, তাতে তোমার বাতব্যাধি হতে পারে। তুমি এখন আস্তে আস্তে বাইরে বেরোতে পার, কিছুদুর যাবে, আবার ফিরে আসবে।

এই সংবাদে খুব খুশি হয়ে মানিক জিজ্ঞেস করল, বাইরে, মানে, কোথায় কতদূর পর্যন্ত?

গুণবন্ত বলল, এখান থেকে বেরিয়ে ডান দিকে একটুক্ষণ গেলেই এক নদী এসে পড়বে, সেখানে যাবে। কয়েকদিন যাও, তারপর অন্য পন্থা বাতলে দেব।

পরদিন তার খাবার নিয়ে এল না নারী। তার বদলে এল এক থুরথুরে বুড়ো। তার হাত সবসময় কাঁপে, থালাটা যে-কোনও মুহূর্তে

পড়ে যেতে পারে, মনে হয়। সে বোধহয় চোখেও ভাল দেখে না।

সেই বুড়ো এসেই একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল ভাল করে খেয়ে নাও, মানিক আমার। আমার যা শরীরের অবস্থা, তাতে আর দু'দিনের বেশি বাঁচব না। যদি মরে গিয়ে চিৎপটাং হই, তাহলে তুমিই তোমার নিজের খাবার আনবে। আর যদি নতুন কোনও কয়েদি আসে, তার খাবার দেবার ভারও তোমাকেই নিতে হবে। বচ্ছরের পর বচ্ছর। তারপর যখন তুমি আমার মতন এক নচ্ছার বুড়ো হবে, তখন তোমার ছেলেকে লাগিয়ে দেবে এই কাজে। তাতে বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে।

মানিক অনেকটা দাঁত কিড়মিড় করে মনে মনে বলল, আমি এই ধারাবাহিকতাকেই ঘেন্না করি। মানুষ কেন যে-যার নিজের অবস্থা থেকে কিছুটা অন্তত উচ্চে উঠতে পারবে না? আর তার ছেলে? হুঁঃ!

বৃদ্ধটি চলে যাবার পর মানিক কদুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এই তোর দিদি আজ আর এল না কেন রে?

কদু বলল, মালিক তাকে অন্য কাজে লাগিয়েছে। কলাগাছ পোঁতার কাজ।

মানিকের মনে হল নারীর সঙ্গে তার আর কোনওদিন দেখা হবে না। আর এটা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা শুরু হল।

তবু দেখা হল নারীর সঙ্গে।

ঘর থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে এসে মানিক নদীর ধারে একটা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশ দেখে। কাছেই একটা লঞ্চ ঘাট। সেখানে অনবরত লঞ্চ আসে, আবার চলে যায়। কিছু যাত্রী নেমে আসে, কিছু যাত্রী ওঠে। একবার একটা বড় স্টিমারও এসেছিল। এই সব আসা-যাওয়ার চিত্র দেখতে ভাল লাগে মানিকের।

দিন তিনেক বাদে, একটা হাসির শব্দ শুনে অন্য দিকে তাকিয়ে সে দেখল, অদূরে তারই মতন রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারী। আগের দেখায় তার মুখখানা খুবই ম্লান ছিল, আজ সেসব মুছে গেছে, তার মুখে রয়েছে ফুরফুরে হাসি।

চোখাচোখি হতেই নারী বলল, কী গো ঠাকুর, তুমি আমায় ফেলে কোথাও যেতে পারবে না। আমি সবসময় তক্কে তক্কে তোমার ওপর নজর রাখি।

মানিক স্নিগ্ধ গলায় বলল, নারী তোমাকে তো বলেইছি, এখন আমি অন্য কোথাও যেতে চাই না। যদি তবুও কোনও কারণে যেতে হয়, তোমাকে না-জানিয়ে যাব না।

নারী বলল, আমি যদি তোমার কাছে কখনও যাই, তুমি রাগ করবে না তো?

মানিক বলল, না, রাগ করব কেন? তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। তোমার যাতে বিপদ না হয় সেটাও দেখো।

এরপর দু'দিন নারী একবার এসেই একটুক্ষণের মধ্যে চলেও গেল। অর্থাৎ সে শুধু মানিককে একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছে।

তারপর একদিন সে এসে বলল, ঠাকুর, ওই যে তালগাছটা দেখছ, তুমি ওই পর্যন্ত যেতে পারবে আমার সঙ্গে? তাহলে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাতে পারি।

স্পাই হতে গেলে আগে ট্রেনিং নিতে হয়। তাতেও অনেকে যোগ্য হতে পারে না।
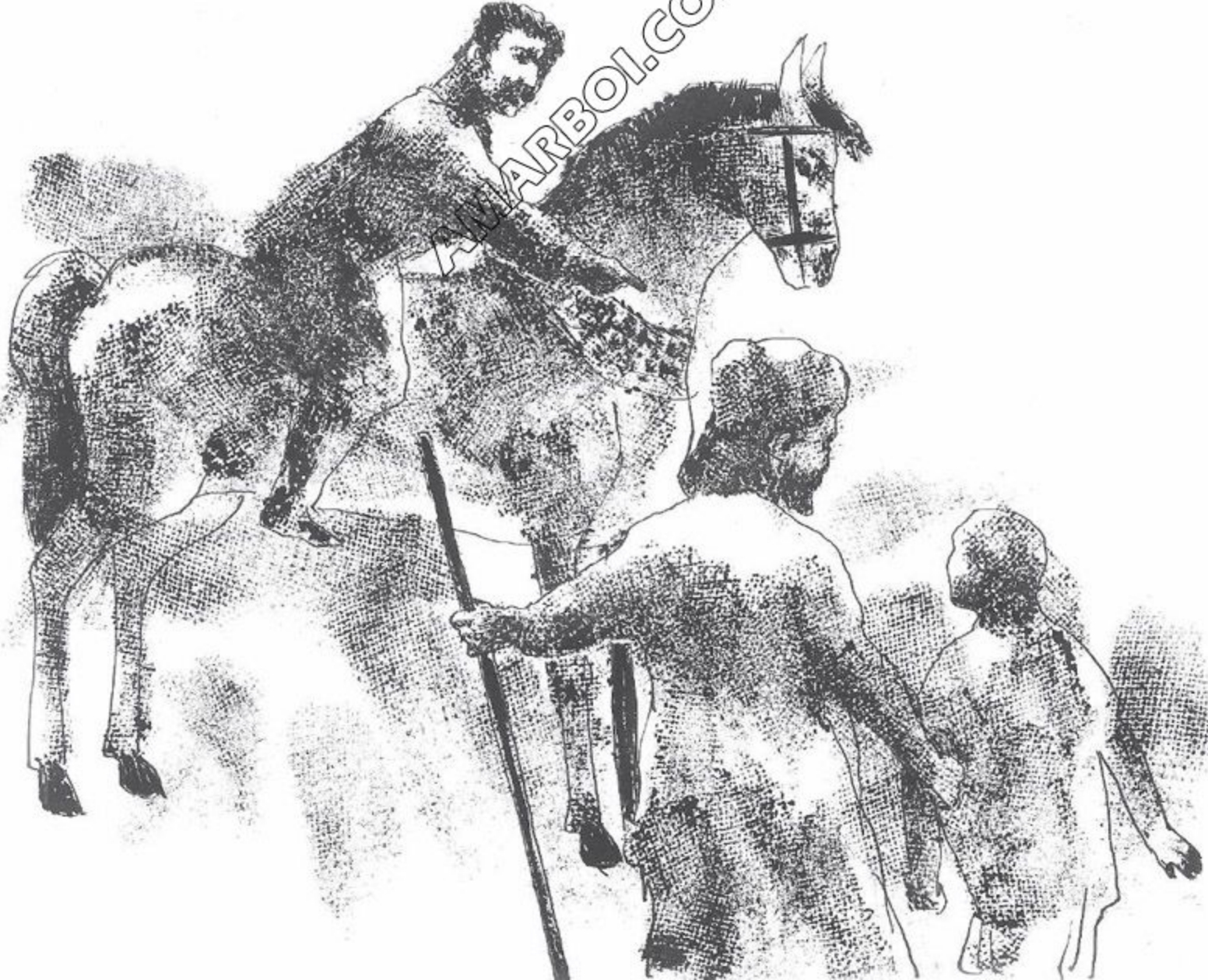
আশ্চর্য কোনও জিনিস সম্পর্কে মানিকের কৌতূহল কিংবা ইচ্ছে অনেক কমে গেছে। তবু সে জিজ্ঞেস করল, সেটা কী?

নারী বলল, আমি মাঝে মাঝেই ওখানে যাই। এক বছর ধরে দেখছি, ওখানকার মাটি ফুঁড়ে একটা কালো পাথর একটু একটু করে উঠে আসছে। মনে হয়, আর একজন দেবতা আসতে চাইছেন আমাদের কাছে। তুমি দেখে বলতে পারবে, সেটা শুধুই পাথর, না কোনও দেবতা!

মাটি ফুঁড়ে একটা মসৃণ কালো পাথর উঠে আসা নতুন কিছু নয়। সকলেই সেটাকে দেবতা হিসেবেই মান্য করে। সেই জন্যই অনেকে সেটাকে নারায়ণশিলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের বিশ্বাসের ওপরেই তো দেবতাদের অবস্থান।

মানিক এসব শুনেছে, কিন্তু নিজের চোখে কখনও দেখেনি। সেই তালগাছটা খুব দূরে নয়, একবার দেখে আসা যেতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে মানিক জিজ্ঞেস করল, তোমার কিসের এত দুঃখ, নারী! সেদিন কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলে। এখন বলবে?

নারী বলল, ঠাকুর, এই ক'দিনেই আমি যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছি। নিজের ভাল-মন্দ অনেকটা স্পষ্ট বুঝতে পারি। না, সেই কথাটা এখনও তোমাকে বলা যায় না। যদি কখনও আমরা রাজ্য থেকে বাইরে যেতে পারি, তখন বলব।

তালগাছটা থেকে নদী বেশ খানিকটা দূরে।

এখানে নানা রকমের টুকরো পাথর ছড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে একটা পাথরের চার দিকে কে যেন একটা দাগ কেটে রেখেছে।

সেই মসৃণ কালো পাথরটা দেখেই মানিক চিনতে পারল, এটা তো একটা নারায়ণশিলা। তাদের বাড়িতেও এরকম একটা আছে। সেই পাথর তার বাবার সেবা পায়। মানিকও অনেকবার সেই দেবতার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছে।

মানিক জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এটার কথা আর কারওকে জানিয়েছ?

নারী বলল, না। তবে আরও অনেকে দেখেছে নিশ্চয়ই। ওই গোল দাগটা তো আমি কাটিনি। এই ক'দিন ধরে দেখছি।

মানিক বলল, আমি তোমাকে একটাই উপদেশ দিতে পারি। তুমি কিছুতেই এ পাথর টেনে তোলার চেষ্টা কোরো না, এমনকী ওতে হাতও ছোঁয়াবে না, দেবতাকে স্পর্শ করা কিংবা একা একা পুজো করার অধিকার কোনও নারীকে দেয়নি হিন্দু সমাজ। শুধু এই অপরাধেই তোমাকে ওরা খুন করতে পারে। এই দেবতার জন্ম দেবার অধিকার আছে শুধু ব্রাহ্মণদের।

নারী বলল, তুমি তো ব্রাহ্মণ। তুমি নিজে কিছু না বললেও ওখানে সবাই জানে, তুমি বামুনের ছেলে।

মানিক বলল, হুঁঃ। ব্রাহ্মণ! আমি যদি এই দেবতার প্রতিষ্ঠা করি, তাহলে মন্দির গড়ার দায়িত্বও নিতে হবে আমাকে। তখন অনেকের সাহায্য পাব, তাও ঠিক। তারপর আমি সারাজীবন সেই মন্দিরের পুরুত সেজে কাটাব? না, নারী, আমি সেজন্য জন্মাইনি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার বলল, আমি কী জন্য জন্মেছি, তাও জানি না। আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে চলেছি।

ওরা কথাবার্তায় এমনই মগ্ন হয়ে আছে যে, লক্ষই করেনি, কিছু দূরের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে দু'জন ষণ্ডা চেহারার পুরুষ, তাদের একজনের হাতে একটা বর্শা, অন্যজনের হাতে একটা ভোজালি।

ওরা দৌড়ে এসে একজন নারীকে লেপ্টে ধরে থেকে, একটা হাতে চেপে রইল তার মুখ। অন্য লোকটি মানিককে বলল, এই, তুই এখান থেকে চলে যা, তোকে আমরা আর কিছু বলব না। যাঃ, পালা!

মানিক তবু দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের সেই চিনচিনে ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে, তার সারা শরীরে অসহায়তার কাঁপুনি। তার শরীর এখনও পুরোপুরি মজবুত হয়নি। তা ছাড়া দু'জন অস্ত্রধারী ষণ্ডা-কে সে বাধা দেবেই বা কী করে?

ওরা দু'জন মিলেই নারীকে ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে চলল। নারী চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ঠাকুর, তুমি চলে যাও। আমার যা হবার তাই হোক, তুমি পালাও।

মানিক দাঁড়িয়েই রইল।

তারপর সে এমন একটা কাণ্ড করল, যা সে যেন নিজেই কয়েক মুহূর্ত আগেও ভাবেনি। সে একটা পাথর খণ্ড তুলে ছুড়ে মারল ওদের একজনের দিকে। সেটা অবশ্য কারওর গায়েই লাগেনি।

ওদের একজন বলল, এই হারামজাদা, তোকে বলেছি না পালাতে? তোকে কিছু করব না। তাও তুই, তাও...তুই কি এখানেই মরতে চাস?

মানিক আর একটা পাথর তুলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি মরতেই চাই। সে আবার পাথরটা ছুড়ল ওদের দিকে।

এরপর যা ঘটতে লাগল, তা অবিশ্বাস্য। মানিকের ওপর যেন ভর করেছে অন্য একটা শক্তি। সে লাফিয়ে লাফিয়ে পাথর তুলে মারছে ওদের দিকে। ওরা মানিকের কাছেই আসতে পারছে না।

মানিকের এই রুদ্র রূপ এরা আগে কেউ দেখেনি। সে যেন অসাধারণ এক যোদ্ধা। দু'জন অস্ত্রধারীর সঙ্গে সে লড়ে যাচ্ছে শুধু পাথরের টুকরো দিয়ে।

একজন অস্ত্রধারী তার হাতের বর্শাটা ছুড়ল তার দিকে, মানিক বিদ্যুৎবেগে সরে গেল, তার গায়ে লাগল না। বরং মানিকের একটা পাথর লাগল তার চোখে।

এদিকে এমনিতেই বেশি লোকজন আসে না, এই সন্ধ্যা নেমে আসার সময় কেউ নেই। এই অসম যুদ্ধের দৃশ্য দেখল না আর কেউ। নারীও লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

যে-লোকটির চোখে পাথর লেগেছে, সে একটা আহত ষাঁড়ের মতন চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। অন্য লোকটি তার কাছে এসে বলল, চল, আজ বিশেষ সুবিধা হবে না। আগে এই শুয়ারের বাচ্চাটাকে কুচি কুচি করে কাটব, তারপর এই মেয়েটাকে...

ওরা দু'জন চলে যাবার পরেও মানিক একটুক্ষণ রাগে ফুঁসতে লাগল। তার সারা শরীরে প্রচণ্ড উত্তাপ।

আস্তে আস্তে শরীরটা শান্ত হলে সে এগিয়ে গেল নারীর দিকে।

খুব শান্ত গলায় সে বলল, উঠে এসো নারী। আর কোনও ভয় নেই।

নারী উঠে বসে চাইল মানিকের দিকে। তার মুখ চোখের জলে মাখামাখি, তার ওপরে লেগেছে ধুলোবালি।

মানিক বলল, ইস এত কেঁদেছ!

নারী বলল, আমি নিজের জন্য কাঁদিনি ঠাকুর। আমার কান্না এসেছে তোমার কথা ভেবে। তোমাকে যে বাঁচতেই হবে! আমার জীবনের কী আর দাম!

মানিক বলল, তোমার জীবনের দাম আর আমার জীবনের দাম একই। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না।

দু'জন বলবান দুর্বৃত্তের সঙ্গে এই দুর্বল শরীর নিয়ে রুখে দাঁড়াবার সাহস সে কী করে পেল, মানিক তা এখনও বুঝতে পারছে না। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে নাকি? আবার যদি এরকম কোনও বিপদের মধ্যে পড়তে হয়, তাহলেও কি আবার এমন সাহস দেখাতে পারবে? খুব সম্ভবত সে পারবে না। এরকম ঘটনা একবারই ঘটে।

যদিও সেদিন কোনও সাক্ষী ছিল না, তবু কী করে যেন সেকথা ছড়িয়ে গেছে অনেক মানুষের মধ্যে। নারীর সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখা হয়নি মানিকের।

সে নাকি আততায়ীদের একজনকে চিনতে পেরেছে, তার নাম লোহার জং। এরকম নাম কারওর হয় কি না, তা জানা না গেলেও অনেক লোকের কাছে সে এই নামেই পরিচিত।

এই লোহার জং কাজ করে গুণবন্ত সিংহ-র একটা পেরেক-বল্টুর কারখানায়, সেখানেও তার নামে একবার ডাকাতির অভিযোগ এসেছিল। আইনের মারপ্যাঁচে ছাড়া পেয়ে যায়। তার স্বভাব খুব রুক্ষ প্রকৃতির। গুণবন্ত ঠিক লোক লাগিয়ে তাকে ধরেও এনেছে। তাকে বেশ কয়েকটা চড়-চাপাটি মেরে তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে।

অন্যটির পরিচয় কিছুটা জানা গেলেও সে এখন পলাতক।

গুণবন্ত মানিকের কাছে এসে বলেছিল, চৌধুরীবাবু, তুমি যে-কাজ করেছ, তার জন্য অনেকেই ধন্য ধন্য করছে। ওই মেয়েটাকে ওই জানোয়ার দুটো পুনা শহরে বিক্রি করে দেবে ঠিক করেছিল, আগেও দু'তিনটে মেয়েকে বাইরে পাচার করেছে। এই ব্যবসাটা এখন ভালই চলছে। তুমি অন্তত একটি মেয়েকে রক্ষা করেছ। এইবার ওরা কিছুটা ভয় পাবে। আমার এলাকার মধ্যে রমণী জাতির ইজ্জত কেউ নষ্ট করতে এলে, আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যা করেছ, তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে হয়। তুমি কী নেবে বলো।

মানিক বলল, আমাকে একটা সিগারেট দিন। অনেকদিন খাইনি, তাই একটা খেতে ইচ্ছে করছে আজ।

গুণবন্ত বলল, সে তো পাবেই। তুমি একটা কঠিন কিছু চাও তো বলো।

মানিক বলল, তুমি তো সবই দিচ্ছ, আর তো কিছু চাইবার নেই। আর কিছুই মনে পড়ছে না।

গুণবন্ত হাসতে হাসতে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি। যাই হোক, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

মানিকও বুঝেছে, এখন কোথাও তার একা একা থাকা উচিত নয়। কেউ ফট করে গুলি চালিয়ে দিতে পারে। কেন ওরা তাকে মেরে ফেলতে চায়? একটাই কারণ থাকতে পারে। ওরা প্রথমে মানিককে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। তবে, সেদিন মানিকের কাছে হেরে গিয়ে নিশ্চয়ই ওদের মানে লেগেছে, ওরা তার প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

মানিক এখন আর বিকেলবেলায় রেলিং ধরে দাঁড়ায় না, সে লঞ্চ ঘাটের একেবারে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তার দিকে তাকায় না, কিন্তু সে সকলকে দেখে।

এর মধ্যে একটি বেশ মজার ঘটনা ঘটল।

মানিক নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, একজন বাঙালিবাবু এক হাতে একটা সুটকেস আর অন্য হাতে একটা গোটানো বিছানা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এল সেখানে। বোঝা দুটো নামিয়ে রেখে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজল।

মানিকের দিকে চোখ পড়তেই সেই বাবুটি বলল, এই ছোকরা, তুই আমার মাল দুটো এই লঞ্চের দোতলায় পৌঁছে দিতে পারবি? তোকে আমি এক আনা দেব।

বোঝা দুটো কতটা ভারী তা না দেখে মানিক রাজি হবে কী করে?

মানিক সেই বোঝা একটা একটা করে মাথায় তুলে দেখল, খুব বেশি ভারী নয়, সে পেরে যাচ্ছে। পা দু'টি একটু ল্যাগব্যাগ করছে বটে, কিন্তু পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

লঞ্চ-এর ভেতরে ঢোকার দরজার কাছে টিকিট পরীক্ষা করছে এক কর্মচারী। বাবুটির টিকিট দেখার পর মানিকের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, এটা আবার কেডা? আপনের কেউ হয়? অর টিকিট কাটেন নাই?

বাবুটি বলল, ও তো একজন কুলি। কুলিদের টিকিট লাগে নাকি?

লোকটি দুটি আঙুল নেড়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে যান গা ভিত্‌রে।

মালগুলি পৌঁছে দেবার পর বাবুটি তাকে একটা আনি তো দিলই, আরও দিল তার নিজের বাড়ির গাছের একটা পাকা গোইয়া (পেয়ারা)।

মানিক ভাবল, এ তো মন্দ নয়। সামান্য পরিশ্রমেই কিছু রোজগার করা গেল। অনেকদিন মানিক নিজে কিছু উপার্জন করেনি।

চৌধুরী বংশের ছেলে সে, তাদের গ্রামে তার চেয়ে বেশি লেখাপড়া কেউ জানে না, তাকে বলল, কুলি? তা বলুক, এখানে তো আর তাকে কেউ দেখতে আসছে না।

দিন তিনেকের মধ্যেই সে মালবাহক হিসেবে বেশ পোক্ত হয়ে গেল। এখন সে বাবুদের সঙ্গে দরাদরিও করে।

এই লঞ্চঘাটায় দু'জন পাকাপাকিভাবে মালবাহক থাকে। তাদের মধ্যে একজনের কুমিরে পা কেটে নিয়েছে কয়েক দিন আগে। তাতেই সে এই সুযোগ পেয়ে গেল। সারাদিনে সে তিন-চারবার ডাক পায়।

একদিন সে দেখল, একটা পরিবার আসছে অনেকগুলি বাচ্চা ও লটবহর নিয়ে। সেই বাচ্চাদের মধ্যে কয়েকটা চ্যাঁ ভ্যাঁ করছে, তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিটি কিছুই ঠিকমতন সামলাতে পারছে না, অনেকখানি ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক স্ত্রীলোক অনবরত বলে যাচ্ছে—ওরে মুড়ির টিন কোথায় রাখছস, আর কাসুন্দির বোতলডা? ওরে, চণ্ডেটাকে ধর ধর জলে পড়ে যাবে...

লঞ্চ ছাড়ার আগে একটা টং টং শব্দ হয়, সেটা বাজতে শুরু করেছে। ওপারে ঘাট আর লঞ্চের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থাকেই, সেখানে একটা তক্তা পেতে দেওয়া হয়, তাই দিয়েই ওঠে-নামে যাত্রীরা। অনেকসময় ওপরে একটা বাঁশও ধরা থাকে, যাতে যাত্রীরা জলে পড়ে না যায়। তবু অবশ্য দু'একজন জলে পড়ে যায়। সারেঙ সাহেব টং টং বাজাচ্ছে। দু'জন খালাসি টেনে তুলে আছে তক্তাটা।

মানিক দৌড়ে গেল সেই খালাসিদের কাছে, একজনের হাত ছুঁয়ে সে দয়া চাইল। তারপর এক লাফে চলে গেল ওদিকে।

সেদিকে গিয়েই সে একটা ছিঁচকাঁদুনে শিশুকে কাঁখে তুলে নিল, অন্য হাতে একটা ভারী টিনের বাক্স। এই পরিবারের বাবুটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, শিগগির চলেন কত্তা, এখনই জাহাজ ছেড়ে দেবে, উঠতে পারবেন না। ম্যাসিন চালু হয়ে গেছে। চলেন, চলেন!

খালাসি দুটি আবার তক্তা পেতে দিয়েছে, সেখানে কোনও রকমের বিপদে না পড়ে সবাই কোনওক্রমে চলে এল লঞ্চে। কর্তাটি বলল, উপরে চলো, উপরে।

ওপরের ডেকে থিকথিক করছে মানুষ, একটা তিল ধারণের মতো জায়গাও খালি নেই। শুধু সারেঙ সাহেবের ক্যাবিনের পেছনে কিছুটা জায়গা খালি আছে, সেখানে কারওর বসা নিষেধ। মানিক সেখানেই শিশুটিকে নামিয়ে দিয়ে পুরুষটিকে বলল, এই স্থানেই কিছুক্ষণ, আমি সারেঙকে কইয়া দিতেছি।

পুরুষটি চোখ কটমট করে বলল, আরে পুঙ্গির পুত, আমাগো মালপত্তরে হাত দিতে তোরে কে কইছে? আমরা নিজে নিজেই সব পারতাম, তুই বুঝি...

মানিক বলল, আমি দ্যাখলাম যে, জাহাজের ম্যাসিন চালু হইয়ে গ্যাছে। আপনেরা আর উঠতে পারবেন না। তাই আমি...

লোকটি বলল, আমরা উঠতে পারি না পারি, তাতে তর কী? তুই বুঝি আমার থিকা পয়সা খিঁচতে চাস। আমি কিন্তু দুই পয়সার বেশি দিমু না।

মানিক বলল, না, না, পয়সাকড়ির কথা আসেই না। আপনেরা তো আমারে ডাকেন নাই!

ঘোমটা ঢাকা স্ত্রীলোকটি বলল, দ্যাখেন না, আমাগো সব জিনিস ঠিকঠাক আছে কিনা। এই অতিসাইরারা দু'একটা জিনিস লুকাইয়া রাখে।

মানিক বুঝতে পারল, লঞ্চের নোঙর তোলা হচ্ছে। এরপর তো সে লাফিয়েও ওপারে যেতে পারবে না। তাই সে আর বাক্য না বাড়িয়ে দৌড়ে চলে এল সিঁড়ির কাছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার মনে একটা নতুন চিন্তার উদয় হল। সিঁড়ি শেষ করে সে ঘাটের দিকে না গিয়ে স্যাৎ করে ঢুকে পড়ল, সিঁড়ির নীচের অন্ধকার জায়গাটায়। তার সবটাই প্রায় নানারকম মাকড়সার জালে ভর্তি। অর্থাৎ, অনেকদিন এখানে কেউ ঢোকেনি।

অন্যদিকে রয়েছে একটা গোল কাচের জানলা। সেখান থেকে বাইরের দৃশ্য অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

সেদিকে তাকাতেই মানিকের বুকটা ধক করে উঠল।

লঞ্চ চলতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটছে কে? এই তো সেই নারী নামের মেয়েটি।

মানিক কথা দিয়েছিল, সে যদি এখান থেকে কখনও চলে যায়, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, অন্তত ওকে না-জানিয়ে সে যাবে না। সে কথা রাখেনি মানিক। নারী তো ভাবতেই পারে যে, সে চুপি চুপি চোরের মতন ওকে কিছু না জানিয়ে পালাচ্ছে। অথচ মাত্র এক মিনিট আগেও

তো সে সিঁড়ির নীচে ঢুকে পড়ার কথা ভাবেনি। ওই ঘোমটা ঢাকা স্ত্রীলোকটি তাকে চোর সাজাতে চেয়েছিল, সেইজন্যই কি...

নারী এখনও ব্যাকুলভাবে ছুটছে। এ লঞ্চ থামানো যাবে না কোনও উপায়েই। এখন লঞ্চ গতি নিয়েছে, নারীকে আর দেখা গেল না।

নারীকে কি সে আরও বিপদের মধ্যে ফেলে গেল? তার নিজের জীবনেও যে আরও কতরকম বিপদ অপেক্ষা করে আছে, তা সে নিজেও জানে না। এই মেয়েটি যে তাকে অত ভালবেসেছিল, তা কি মানিক বোঝেনি? তার কোনও প্রতিদানও সে...। কেন দু'জনে মিলে যে-কোনও বিপদের মুখোমুখি হতে পারল না?

মানুষ অনেক সময় মনে মনে চিৎকার করে কথা বলে, কিন্তু বাইরে তার টুঁ শব্দটিও শোনা যায় না। মানিক নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে গর্জন করে বলতে লাগল, বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!

সেই সঙ্গে সঙ্গে মানিক কাঁদতেও লাগল। নিঃশব্দে। অশ্রুধারায় ভিজে গেল তার বুক।

চার

ফরিদপুরের জেলাশাসক ক্রিস্টোফার স্যান্ডহার্স্ট এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছে স্কটল্যান্ড থেকে।

একদিকে সে অতি নৃশংস, আবার কখনও কখনও সে অতি উদার। তার আদালতে কোনও কোনও মামলার কিছুটা অংশ শোনার পর সে বলে ওঠে, ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ টাইম! এর পরেই আসামি পক্ষের দু'জনকে সে ফাঁসির হুকুম দিয়ে দেয়। এ পর্যন্ত সতেরোজনকে সে ফাঁসি দিয়েছে।

আবার এমনও হয়, হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে জেগে উঠে স্যান্ডহার্স্ট দু'জন অফিসারকেও ঘুম ভাঙিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসে জেলখানার মধ্যে। সেখানে দু'জন আসামিকে ভোরবেলাতেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবার কথা, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, জেলারও সেখানে উপস্থিত।

সবাইকে শুনিয়ে স্যান্ডহার্স্ট বলল, এই দু'জনকে ছেড়ে দাও। ওরা নির্দোষ। আমারই ভুল হয়েছিল। ওদের নিয়ে আর মামলা চালাবারও দরকার নেই। কেস ডিসমিস। আর দু'দিন ওদের জেলখানার ওয়ার্ডে রেখে দাও। তারপর কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে গেটের বাইরে পৌঁছে দিয়ো।

এটা বড্ড বেশি নাটকীয় নয়? আরও একবার এইরকম কাণ্ড করেছিল স্যান্ডহার্স্ট। এছাড়াও তার কিছু কিছু শখ আছে। এদেশে আসার আগেই সে কিছুটা সংস্কৃত শিখেছিল। এখন শিখছে বাংলা, এর মধ্যেই সে বাংলা নির্ভুল বলতে পারে। বাংলা ভাষায় কতরকম গালিগালাজ হয়, তা সে সংগ্রহ করছে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে। তার আগে এ কাজ আর কেউ করেনি, এ দেশীয়রাও নয়, বিদেশিরাও নয়।

বেশ কিছু গালাগালি মুখস্থও করে ফেলেছে সাহেব। কিন্তু কোথায়, কোন পরিবেশে এসব চলে, তা শেখা তো সহজ নয় মোটেই। একদিন অনেকের সামনে সে একজন অধঃস্তন পুলিশকে এমন একটা গালাগালি দিয়েছিল, যাতে অন্য সবাই লজ্জায় মুখ নিচু করেছিল। কয়েকজন আবার হাসি চাপতে গিয়ে কেশে উঠল খুব জোরে।

সাহেব ঘোরাঘুরি করে ঘোড়ার পিঠে। খুব বৃষ্টি, বাদলার দিনে ব্যবহার করে পালকি। আবহাওয়া যতই খারাপ হোক, তবু সাহেব বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারে না, বেরিয়ে পড়ে।

সেদিন প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি পড়ছিল, বিকেলের দিকে তা অনেকটা কমে গেছে। ইলশেগুঁড়ির মতন বৃষ্টির কণা উড়ছে বাতাসে। তা গায়ে মাখতে অনেকেই ভালবাসে।

সাহেব একবার ভেবেছিল, এখন পালকি ছেড়ে ঘোড়ায় উঠবে, বিভিন্ন শহরে সাহেবের জন্য কয়েকটা বাংলো নির্দিষ্ট আছে। এখানকার বাংলোটি খুব কাছে। তাই সাহেব আর বদলা-বদলি করল না। পালকির দু'দিকের পর্দা খোলা, সাহেব একটু ঝুঁকে বসেছে, যাতে বাইরের মানুষ তাকে দেখতে পায়।

রাস্তার দু'পাশেই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ, তারা সাহেবকে দু'এক পলক দেখতে চায়। কেউ কেউ নানারকম জয়ধ্বনি করছে, জয় ভারতমাতা রানি ভিক্টোরিয়ার জয়, জয় সদানন্দ সাহেবের জয় (স্যান্ডহার্স্ট-এর বাংলা নাম এই পর্যায়ে পৌঁছেছে)! কিছুক্ষণ আগে মাত্র তিনটি লোক চেঁচিয়ে বলেছিল, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম! সাহেবের চারজন দেহরক্ষী পেছনে পেছনে আসছে। তারা ছুটে গিয়ে দু'টি লোককে ধরে ফেলল, আর একজন ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই দু'জনকে মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হল কাছাকাছি একটা থানায়।

এখানে ঘটল আর একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

ভিড়ের ভেতর থেকে অনেকটা বাইরে বেরিয়ে এল এক স্থানীয় কন্যা। তার পরনে শুধু একটা ময়লা শাড়ি, হাতে দু'টি পাথরের টুকরো। সেই দুটো পাথরই সে ছুড়ে দিল সাহেবের পালকির দিকে। কোনওটাই লাগল না অবশ্য। তাই সে মাটি থেকে তুলতে গেল আর একটা পাথর।

দৃশ্যটি এমনই প্রকাশ্য যে, তা দেখতে পেল অনেকেই। তারা ভাবল, এখানেই বুঝি গুলি করে মারা হবে মেয়েটিকে। সেটা তো না দেখে যাওয়া যায় না। তারাই পালাতে গিয়ে একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে রইল। সাহেবের দেহরক্ষীরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে, একজন চেঁচিয়ে বলল, ড্রপ দ্যাট স্টোন, রেইজ ইয়োর হ্যান্ড, স্ট্যান্ড স্টিল, আদার ওয়াইজ উই উইল শুট ইউ! একজন বাংলায় বুঝিয়ে দিল, ওরে হতভাগী, পাথরটা ফেলে দে, মাথার ওপরে হাত তোল, নইলে গুলি খেয়ে মরবি।

সাহেবও সব দেখেছে। কী কারণে যেন পালকিবাহকরা থেমে গেছে এখানে। সাহেব বাইরের দিকে অনেকটা মুখ বার করে বলে উঠল, ডোন্ট শুট, ডোন্ট শুট, ডোন্ট শুট! ওই মাগিটিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনো আমার চেম্বারে।

তারপর পালকিবাহকদের প্রতি বলল, এই ইবলিশের বাচ্চা, থামলি কেন? চল চল!

তারপর সাহেব মাথা হেলিয়ে আরাম করে বসল। গুনগুনিয়ে একটা গানও গাইবার চেষ্টা করল, ছেড়ে দাও, রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না...।

বাংলোটির গেটের সামনে হাত জোড় করে কয়েকজন ভৃত্য ও খিদমদগার। সাহেব পালকি থেকে নেমে প্রথমেই গেল শৌচাগারে। একটু পরে সেখান থেকে বেরিয়ে নিমাই, নিমাই বলে হাঁক দিল। এই বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিমাইয়ের, সে কাছাকাছিই ছিল, দৌড়ে এসে সাহেবের সামনে দাঁড়াল হাত জোড় করে।

সাহেব তাকে বলল, এই শুয়োরের বাচ্চা, কতদিন ওটা পরিষ্কার করিসনি? ডাক, ডাক, সাফাইওয়ালাদের ডাক। আমি চাই, আজকের মধ্যেই কোথাও যেন এক টুকরা ধুলা না থাকে। যদি তাতেও গাফিলতি হয়, তাইলে তৎকালে তুই কী শাস্তি পাবি, তা জানিস? এক মাহিনার বেতন পাবি না।

নিমাই চোখ ছলছলিয়ে কিছুটা কান্না কান্না ভাব দেখাল, সেটা অভিনয়। কারণ সে ভাল করেই জানে যে, যাবার সময় সাহেব তার এই শাস্তি মকুব করে যাবে। বেতন ঠিকই পাবে সে।

এ বাড়িতে দু'টি বৈঠকখানা। সামনের দিকেরটাই বেশ বড়। সেটা সাধারণ প্রজাদের জন্য। আর ভেতরের দিকে ছোট একটি ঘর, সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে শলা-পরামর্শ হয়।

সাহেব সে ঘরে গিয়ে দেখল, সেই কক্ষটি মোটামুটি পরিচ্ছন্নই আছে। কাঠের টেবিলে একটা আঙুল ঘষে সে দেখল, আঙুলে ধুলা লাগেনি।

টেবিলটার তিন পাশে রয়েছে কয়েকটি বেতের চেয়ার, আর অন্য দিকের চেয়ারটি বেশ রাজকীয় ধরনের।

সেটায় বসে সাহেব একটা চুরুট ধরাল। এক ব্যক্তি কিউবা নামের বহু দূরের এক দেশ থেকে এই চুরুট একবাক্স তাকে উপহার দিয়েছে। এই চুরুট টানার একটা উপকার হয়। কিছুক্ষণ টানার পর শরীর থেকে

রাগ-ঈর্ষা ইত্যাদি পালাতে শুরু করে।

অচিরেই সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এল তার দেহরক্ষীরা। তার শাড়িতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ, ঠোঁটের এক পাশেও জমে আছে রক্ত। মাথার চুল এমনি উস্কোখুস্কো যে, তাকে দেখে পাগলিনী মনে হয়। সত্যিই কি সে পাগল, না স্পাই, সেটা দেখতে হবে। অনেক গুপ্তচরও যে পাগল-ছাগল সাজে তা তো সে জানে।

সাহেব তার রক্ষীদের বলে এসেছিল, স্ত্রীলোকটিকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে আনতে, মারধোর না করার কথা বলেনি। সেই সুযোগ নিয়েই তারা একটি রমণীকে অনেক অঙ্গে আঘাত করে হাতের সুখ করে নিয়েছে।

ভারতে দেখার মতন অনেক কিছু আছে, অনেক মানুষও বেশ গুণী, সে সব জেনেও সাহেব দুটি কারণে ভারতীয়দের ঘৃণা করে। এক হচ্ছে, এদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যেন কোনও জ্ঞানই নেই, আর এরা যখন-তখন স্ত্রীলোকদের গায়ে হাত তোলে। এ দেশে প্রায় সব রমণীরই জীবন ক্রীতদাসদেরও অধম।

দেহরক্ষীদের তম্বি করে সাহেব মেয়েটিকে বলল, বৈঠো ইস চেয়ার পর, পানি পিয়োগে?

কোনও বিচারক স্থানীয় সাহেবের সামনে বসে থাকার অধিকার প্রজাদের নেই। তারা সব সময় দাঁড়িয়ে থাকবে।

মেয়েটি দাঁড়িয়েই আছে, তাই সাহেব একটা চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বলল, বৈঠো হিঁয়া পর। তুম পানি পিয়োগে?

স্ত্রীলোকটি মোটেই পাগলিনী নয়, সুস্থ, সাধারণ মানুষের মতন কণ্ঠস্বরে বলল, হুজুর আমি বাংলা ছাড়া আর কোনও ভাষা বুঝি না।

সাহেব হা-হা করে হেসে উঠে বলল, তাই তো, তাই তো, আমি ওর সঙ্গে হিন্দিতে বাতচিৎ করছি কেন? এ তো বাংলা-মেয়ে। শোনো, আমি বাংলাও ভাল জানি, তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি জল খাবে?

মেয়েটি একটি চেয়ারে বসে ঘাড় হেলিয়ে জানাল, জল সে খাবে।

সাহেব তার দেহরক্ষীদের বলল, তুমলোগ চলে যাও। এক বর্তন পানি ভেজ দেও।

সে আবার চুরুটে টান দিল। তার মন এর মধ্যেই অনেকটা স্থির হতে শুরু করেছে। এখন সাহেব কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলল, আমি আপনার প্রতি চরম অন্যায় করেছি, আপনার দিকে পাথর ছুড়ে মেরেছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিন, আমাকে আপনি জেলে পাঠান, কিংবা ফাঁসি দিন।

মেয়েটির পুরো মুখটা আগে দেখেনি সাহেব, এবার দেখে প্রায় আঁতকে উঠল। তার মুখের একটা দিকে অনেকগুলি কালো কালো ছাপ, তারই মধ্যে দগদগ করছে কয়েকটি ক্ষত, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রস। বীভৎস দৃশ্য, সেদিকে তাকালেই ঘেন্নায় চোখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, তার অন্য গালটি অক্ষত, মসৃণ, একটুও দাগ-টাগ নেই। মনে হয় যেন একটিই রমণীর দু'টি মুখ।

কিছুটা সামলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ওগুলি আগুনের ছাপ, তাই না?

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, জি হুজুর।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করল, ওটা কি অ্যাকসিডেন্ট, আই মিন দুর্ঘটনা? নাকি কিছু বদমাস তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?

মেয়েটি বলল, আমার এই দশার জন্য দায়ী ভগবান। আগুন আমি নিজেই লাগিয়েছি। তবু যে আমি বেঁচে উঠলাম, সেটা নিশ্চয়ই ভগবানের শাস্তি।

সাহেব শুধু যেন নিজেকেই শুনিয়ে ইংরেজিতে বলল, পুয়োর গড, বেচারি ভগবান, তাকে নিজের কাঁধে কতরকম দায়িত্বই নিতে হয়।

তারপর আবার বলল, তুমি আমার দিকে পাথর ছুড়লে কেন? আমাকে মেরে ফেলার জন্য?

মেয়েটি বলল, না সাহেব, আমার হাতের টিপ খুব ভাল। আমি আমগাছের উঁচু ডালে ঢিল মেরে আম পাড়তে পারি। আমি তো ইচ্ছে করেই আপনার তাঁবুর দিকে পাথর ছুড়িনি, আপনার শরীরে যাতে একটুও আঘাত না লাগে...

সাহেব বলল, তুমি প্রস্তরখণ্ড ছুড়েছ, অথচ আমাকে আঘাত দিতে চাওনি, এর মর্ম তো আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কেন পাথর মারলে, সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলো।

মেয়েটি এখন অনেকটা সতেজ হয়ে উঠেছে, তার গলা আর ভয়ে কাঁপছে না। সে বলল, হুজুর আমি ওই কাণ্ডটা করেছি, যাতে অনেক লোক সেটা দেখে, অনেকেই বোঝে যে, দোষ আমারই। আপনার পুলিশ তখনই আমাকে ধরে মারধোর শুরু করে, যদি মেরেই ফেলে একেবারে, তাহলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল। আর যদি একেবারে না মেরে ফেলে জেলখানায় ভরে দেয়, সেটাও আমার পক্ষে ভাল।

সাহেব বলল, স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেঞ্জ! এরকম ঘটনার কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। তুমি কোনও দোষ করোনি, তবু তুমি মরতে চাও কেন?

সে আস্তে আস্তে বলল, এই পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার কোনও অর্থই নেই। কোনও স্থানও নেই। আমার পক্ষে এখন মরে যাওয়াই ঠিক। হুজুর, আমি একবার আত্মহত্যা করতে গেছি, তবু বেঁচে রইলাম। আবার আত্মহত্যা করার সাহসও আমার নেই। অন্য কেউ আমাকে মারুক।

সাহেব বলল, ওসব কথা পরে শুনব। এখন তোমার পরিচয় বলো, কী নাম তোমার, কোথায় বাড়ি?

মেয়েটি বলল, আলেয়ামনি। আমার জন্ম নকড়ি-ছকড়ি গাঁয়ে।

ভুরু কুঁচকে সাহেব বলল, আলেয়ামনি? এ আবার কেমন নাম? তুমি বুঝি মোছলমান?

মেয়েটি বলল, না, না, হুজুর, আমরা হিন্দু। তবে আমার বাবা ওই নামে আমাকে ডাকেন। তাতে নাকি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

সাহেব বলল, আলেয়া কথাটার মানে কী জানো?

সে বলল, বোধহয় ঠিক জানি না। তবে শুনেছি বড় বড় খাল বিলে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ দপ করে একটা আগুন জ্বলে ওঠে। খুব বড় একটা মশালের আগুনের মতন। সেটা লাফিয়ে লাফিয়ে এদিক ওদিক যায়। অনেকের মনে হয়, সেই আগুন ঠিক একটা মেয়ের মতন। কিংবা পেত্নিও হতে পারে। কেউ যদি সেই আলেয়ার খুব কাছে যায়, কিংবা তাকে ধরতে চায়, তাহলে তাকে নাকি আলেয়া নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, কখনও তাকে মেরেও ফেলে।

সাহেব বলল, কী যেন একটা গ্যাসের ব্যাপার। ওগো মেয়ে, তুমি যদি সত্যিকারের আলেয়া হও, আমাকে যেন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ো না!

এই সময় একজন ভৃত্য একটা গামলাভর্তি জল নিয়ে এল, সঙ্গে একটা মাটির গেলাস। আলেয়া নিদারুণ তৃষ্ণার্তের মতন, পরপর ছ'গেলাস জল খেয়ে ফেলল।

সাহেবের হাতের চুরুটটা নিভে গেছে। সে টেবিলের তলা থেকে একটা পাটকাঠি তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওরে কে আছিস রে, আমার এটা জ্বেলে দে।

চুরুট ধরাবার পর দু'বার আরামের টান দিল সাহেব। তারপর বলল, এবার সত্যি করে বলো তো, তুমি কেন মরতে চাও!

আলেয়া নামে মেয়েটি একটু থেমে থেমে বলতে লাগল, হুজুর আমার বাবাকে আমরা খুব ভালবাসি। আমার বাবার মতন এমন ভাল মানুষ হয় না। আমরা গরিব, কিন্তু বাবা আমাদের সবসময় আগলে রেখেছেন। আমাদের কোনও আঘাত পেতে দেননি। আমার আগের বোনদের বিয়ে দিয়েছেন বাবা যথাসাধ্য খরচ করে। এরপর আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। কিন্তু তার হাতে আর টাকাপয়সা নেই, কোনও রোজগারও হয় না। আমার গালের এইসব দাগ লাগার আগেও আমি তো সুন্দরী ছিলাম না, আমাকে কেউ বিয়ে করার কথা বললে কিছু কিছু পাত্রপক্ষ দু'তিন গুণ পণের টাকা হাঁকে। কয়েকটা বুড়ো দোজবরে বা তেজবরে বিয়ে করতে রাজি আছে, কারণ সেটাই তাদের ব্যবসা। তারা একটার পর একটা বিয়ে করে

আমার বাবার মতন অসহায় বামুনদের ধর্মটা কোনওরকমে বাঁচিয়ে দেয়। তারপর সেই বউকে ফেলে রেখে, গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্র যা পারে হাতিয়ে নিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়, আর কোনওদিন তাদের সঙ্গে দেখা হয় না। এদের শাস্তি দেবার কোনও ব্যবস্থা আছে?

সাহেব বলল, হ্যাঁ আছে। এদের শাস্তি দেবার জন্য নতুন আইনও হয়েছে। কিন্তু আইনের হাত গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় না। তারা এই আইনের কথা জানেও না, মানেও না।

আলেয়া বলল, আমার বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের বুড়ো-বুড়ো লোকেরা দাঁত খিঁচোচ্ছে আমার বাবার দিকে। এরপর তারা ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেবে। শেষ পর্যন্ত বাবা বাধ্য হয়ে ওই রকম এক তেজবরের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তার বয়েস আমার বয়সের দ্বিগুণেরও বেশি। আপনিই বলুন হুজুর, আমি কি সারা জীবন এই শাস্তি মেনে নিতে পারি? আমার প্রতিবাদ করারও শক্তি নেই। এখন যদি আমি নিঃশব্দে সরে পড়ি, তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তাই না?

রাগে সাহেবের মুখ রক্তিম হয়ে এল। সে বলল, না, তাতে কিছুই সমাধান হয় না। আমাদের সরকারের নীতি এই যে, কেউ যদি সত্যিই কোনও বড় অপরাধ করে থাকে, তাকে কঠিন শাস্তি দিতেই হবে। আর অন্য কেউ যদি কারওর নামে মিথ্যে মামলা সাজায়, আমরা সব শক্তি দিয়ে তাকে বাঁচাব। আর যে গিধ্রটা মিথ্যে মামলা সাজায়, তাকে খুঁজে এনে আমার হাবসি ভৃত্যদের দিকে ছুড়ে দেব। তারা সবকজনাই এক একটি উপোসি বাঘ। ওরা সবাই মিলে ওই শালার পেছন মেরে মেরেই ওকে শেষ করে দেবে। তোমাদের মৃত্যুরও একটা দেবতা আছে না? কী যেন তার নাম, জুমো না (অদ্ভুত ধর্ম, এদের সব কিছুর জন্যই এক একটা দেবতা ফিট করা থাকে। জ আর য-এর উচ্চারণে কী যে তফাৎ আজও তা বুঝলাম না।) কী যেন, তুমি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। তুমি সরাসরি তার কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসেছ, এখন আর তোমার মরে যাবার উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ কোনও দেবতা বা দানবকেই গ্রাহ্য করে না। আমরা এই ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি রুল অফ ল। সেটা যে কী বস্তু এখন তুমি তা বুঝবে না, একসময় আমি বুঝিয়ে দেব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কোথায় থাকবে?

আলেয়া বিমূঢ়ের মতন এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বলল, তা তো জানি না। যদি এইখানেই মাটিতে শুয়ে থাকি।

সাহেব বলল, না, তুমি তা পারো না। সরকারি কাজে কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সরকারি অফিসঘরে কোনও বাইরের মেয়ে এসে রাত কাটাবে, সেটা সরকারি নিয়মের মধ্যে পড়ে না। জায়গাটার সম্পর্কে প্রশ্নটা আসল নয়, তুমি এই বাড়িতে রাত্রিযাপন করলে তোমাদের হিন্দু সমাজ শোরগোল পাকাবে না?

একটুক্ষণ সাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, তা হলেই বুঝুন হুজুর, আমি মরে গেলেই আর এসব সমস্যা থাকবে না! হুজুর, আমাকে দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে মরতে দিন।

সাহেব আবার উচ্চস্বরে ডাকল, গণেশ, গণেশ।

ওই নামের ব্যক্তিটিও এখানকার একজন কর্মচারি। কাছেই ছিল, দৌড়ে এসে সে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

সাহেব জিজ্ঞেস করল, তুই তো হিন্দু, তাই না?

সে বলল, ছিলাম খোদাবন্দ, এক মুসলমান মেয়েকে শাদি করার পর আমিও পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

সাহেব বলল, উত্তম কথা। তোমার নাম এখনও গণেশ?

সে বলল, না, হুজুর, আমার নাম এখন ইমতিয়াজ, তবু অনেকে এখনও আমাকে গণশা, গণশা বলে ডাকে।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার বউয়ের নাম তো পূর্ণিমা? আমার বেশ মনে আছে।

গণেশ বলল, আজ্ঞে খোদাবন্দ, সেটা ছিল আগের বউয়ের নাম। এখন এই বউয়ের নাম ফিরোজা।

সাহেব বলল, তুই তো বেশ এলেমদার লোক দেখছি। আগের বউকে বিদায় করে আর একটা বউও পেয়ে গেছিস। এই অফিসে কি একজন হিন্দুও কাজ করে না?

গণেশ বলল, একজন আছে স্যার। তার নাম বাঁটকুল, ডাকব তাকে?

নাম শুনেই বোঝা যায় লোকটির চেহারা হবে বেশ ছোট। প্রায় বামনের মতন। তার কপালে তিলক কাটা।

সাহেব জিজ্ঞেস করল তাকে, তুই কী কাজ করিস রে?

চেহারা অত ছোট হলেও তার গলার আওয়াজ বেশ মোটা! সে বলল, হুজুর, আমি রান্না করি। কত্তারা যা খেতে চান, আমি ঠিক রেঁধে দিতে পারি। আপনি খাসি কাবাব ভালবাসেন, তারও ব্যবস্থা করে রেখেছি।

সাহেব বলল, থ্যাঙ্ক ইউ! তোর বউ আছে?

বাঁটকুল কিছু উত্তর দেবার আগেই গণশা বলল, ওর বউ কিন্তু বেশ লম্বা।

সাহেব বলল, বেশ। তুই তো হিন্দু, কিছু পুজো-আচ্চা করিস?

বাঁটকুল বলল, কর্তা স্যার, আমি প্রতিদিন সকালে জনার্দনের পুজো না করে এক ফোঁটা জলও খাই না। আমার স্ত্রীও তাই।

সাহেব ভুরু কুঁচকে বলল, য্যানাদরদন? আগে তো কখনও এর নাম শুনিনি। নতুন দেবতা?

তখন তিন-চারজন মিলে এক সঙ্গে জনার্দন বিষয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল। সাহেব হাত তুলে সকলকে থামিয়ে দিয়ে শুধু গণেশকে বলল, অ্যাই, তুই মোছলমান হয়েছিস, এখন আর এই সব ব্যাপারে তোর কথা বলার অধিকার নেই। যাক, ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই আমার। তবে এটা বোঝা গেল, এই বাঁটকুল আর তার পরিবার খাঁটি হিন্দু! সেটাই যথেষ্ট। ওরে বাঁটকুল, এই যে স্ত্রীলোকটি, একে তোর কোয়ার্টারে আশ্রয় দিতে পারবি? ও তোর বউয়ের পাশে শোবে।

বাঁটকুল বলল, কেন পারব না, হুজুর! এটাই তো আমাদের ধর্ম। আমরা বউ আর উনি বিছানায় শোবেন, আমি মাটিতে চাদর পেতে...

সাহেব তার জেব থেকে দু'টি মুদ্রা বার করে বলল, এই নে, তোর

খাইখরচা। তবে সবসময় এর ওপর নজর রাখতে হবে। মনে হয়, এর মাথায় কিছু পাগলামি ঢুকেছে। এ যদি পালাবার চেষ্টা করে, সবাই মিলে ওকে ধরে ফেলবি। তখনও ছটফট করলে, ওকে চড়-চাপড় মারবি। কিন্তু কোনও অস্ত্র যেন না লাগে। যা, ওকে নিয়ে যা।

আলেয়া এগিয়ে এসে সাহেবের দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর লক্ষ্মী মেয়ের মতন বাঁটকুলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সাহেব আবার আরাম করে চুরুট ফুঁকতে লাগল।

সেই ঘরটার পেছনে একটা লম্বা অলিন্দ। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে একসময় একজনকে দেখা গেল, সাধারণ মেয়েদের চেয়েও একটু লম্বা মতন, মাথায় আধ ঘোমটা।

তার কাছে গিয়ে বাঁটকুল বলল, টুনি, একে তোর কাছে রাখ। পরে এসে সব বলব। এখন আমাকে সাহেবের কাছে থাকতেই হবে। সাহেবের খাওয়া-দাওয়া মিটলে, আসছি, আসছি।

সে দৌড়ে ফিরে গেল।

বাঁটকুলের বউ হাসি মুখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তার পর সে আলেয়ার থুতনিতে হাত দিয়ে সে বলল, তুই কবে থেকে আলেয়া হলি? আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। তুই তো আমাদের সেই নারী। কত ছোট্ট বয়েস থেকে তোকে দেখেছি। এখন তুই অন্যরকম সাজ করেছিস। আমি মাঝে মাঝে নারীর বদলে তোকে নেড়ি বলে ক্ষ্যাপাতাম।

নারী বিস্ফারিত চেয়ে রইল টুনির দিকে।

টুনি বলল, আমিও তো ওই পঞ্জাবি বাবুর হাভেলিতে অনেক দিন কাটিয়েছি। প্রত্যেকদিনই ভাবতাম, কবে আমার মরণ হবে। উঃ, সেই সব দিন...তোর মতন একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখেও আমার খুব কষ্ট হত। এখন আমার স্বামী, সবাই যাকে বাঁটকুল বলে, সে আমাকে বিয়ে করতে চাইল বলেই তো আমি বেঁচে গেলাম। মানুষটার শরীর ছোট, কিন্তু হৃদয়টা মস্ত বড়। আমি এখন বেশ সুখে আছি রে, সুখে আছি। তুইও ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিস, বেশ করেছিস। তুই কী করে পালালি রে?

নারী জড়িয়ে ধরল টুনিকে। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, দিদি, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি আর পারছি না।

টুনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুই আমার কাছে এসেছিস, এখন আমি দেখব কোন বাপের ব্যাটা তোর গায়ে হাত দিতে পারে। চল, ঘরে চল, সেখানে গিয়ে সব কথা শুনব।

পাঁচ

এ লঞ্চটা কোথায়, কোন দিকে যাচ্ছে, তা মানিক জানে না। জানার চেষ্টাও তো করেনি। কারণ তখন তো সে চিন্তাও করেনি এইভাবে পালাবে।

এরপর কী হবে? সে একটা তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতন অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছে। কতক্ষণ বা কদিন এখানে থাকতে হবে, তাও তো সে জানে না! অনবরত তার মুখে এসে পড়ছে মাকড়সার জাল।

লঞ্চটা একটানা চলছে না, মাঝে মাঝে থামছে, কিছু যাত্রী ওঠা-নামা করছে, তাও সে টের পায়। দুপ দুপ শব্দ হয় তার মাথার ওপরে সিঁড়িতে। এরকম কোনও জায়গায় তার নেমে পড়ারও সাহস নেই। ধরা পড়ে গেলে প্রথমেই ওরা তাকে খুব মারবে নিশ্চয়ই।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকলে একসময় চোখ সয়ে যায়। তখন অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় কিছু কিছু। মানিক একসময় দেখতে পেল অস্পষ্টভাবে, অন্য কোণটায় পড়ে আছে এক রমণীর দেহ। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। স্ত্রীলোকটি হয় গভীরভাবে ঘুমন্ত অথবা অজ্ঞান বলেই মনে হয়।

সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মানিক, কেটে গেল কিছুটা সময়। তার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। কোনও অনাত্মীয়, অচেনা মহিলার গা ছোঁওয়া যে উচিত নয়, এই ধরনের শিক্ষা নিয়েই সে বড় হয়েছে।

সে কিছুটা এগিয়ে এল। তারপরই দেখল, সেই মেয়েটির একটা হাত পড়ে আছে খানিকটা দূরে, শরীর থেকে বিচ্যুত হয়ে। এবার সে সেটা ছুঁয়েই বুঝতে পারল, সেটা রক্ত-মাংসের নয়, মাটির!

এবার সে উল্টে দিল সেই মূর্তিটাকে। হ্যাঁ, কোনও দেব-দেবীরই পূর্ণাঙ্গ মূর্তি, অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে, সাজগোজের শাড়িটাও নেই। তা হলে কোনও দেবীই তো! সরস্বতী বা লক্ষ্মী হতে পারে, গলায় একটা শুকনো ফুলের মালা। খুব সম্ভবত এর পুজো আগেই হয়ে গেছে। তারপর মূর্তিটাকে এই নদীতে বিসর্জন না দিয়ে কেন এই আবর্জনার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে, তা কে জানে!

খুব বিপদের সময় মানুষ এমন দু'একটা কাজ করে বসে, যার কোনও যুক্তি নেই।

মানিক মূর্তির পা দুটো চেপে ধরে বলতে লাগল, মা, তুমি আমায় রক্ষা করো। আমার খালি মনে হচ্ছে, আমার দিকে ধেয়ে আসছে মৃত্যু। আমি কিছুতেই মরতে চাই না। মা, আমি তোমার দাসানুদাস, সারাজীবন তোমার সেবা করে যাব। আমাকে রক্ষা করো, মা।

বারবার এই কথাই বলতে লাগল মানিক। সে কি জানে না যে, মাটির মূর্তির সঙ্গে কথা বলাও এক ধরনের পাগলামি!

ওই কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ওই মূর্তির পায়ের কাছে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল। বেশিক্ষণের জন্য নয়, এরই মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখল, একটা হাঁস উড়তে উড়তে তার মাথার চারপাশে ঘুরছে। আর কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। এরই মধ্যে তার মনে হল, হাঁসটাই বাস্তব, আর তার নাম ধরে ডাকাটাই স্বপ্ন। এই রকম সময়ে স্বপ্ন আর বাস্তব নিয়ে বেশ সংশয়ে পড়তে হয়।

একটু পরে সে পুরোপুরি চোখ মেলে শুনতে পেল, সত্যিই কেউ ডাকছে তাকে, নাম ধরে নয়, বলছে এই, এই! বেরিয়ে আয়, শিগগির বেরিয়ে আয়! নইলে বল্লমের খোঁচা খাবি।

মানিক জানে, এরকম জায়গায় তার বীরত্ব দেখাবার কোনও উপায়ই নেই। বরং তার দুর্বলতা দেখালে কারওর কাছ থেকে হয়তো একটু দয়া পেতে পারে।

সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল সামনে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বল্লমধারী মানুষ। পরনে একটা লুঙ্গি, আর খালি গা। মধ্যবয়েসি।

সে বলল, কী রে গাঁইয়াভূত! তুই ওইখানে লুকায়ে থেকে বাঁচবি ভেবেছিলি? উপরের দিকে দুইটা সিঁড়ির মাঝখানে যে-টুক ফাঁক, সেখান দিয়ে ভাল করে কিছু দেখা না গেলেও শব্দ শোনা যায়। তুই নাক ডাকছিলি।

মানিক বলল, অ্যাঁ। আমি নাক ডাকি নাকি? না, কোনও দিন না।

বল্লমধারী বলল, তোর নাক ডাকে কি না, তুই তা জানবি কী করে? যার নাক ডাকে, সে নিজে কখনও শুনতেই পায় না। তোর নাক ডাকা শুনে বুঝলুম, তুই চোর-টোর কিছু না। কোনও চোরই চুরি করতে এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় না! উঠে আয়, চল আমার সঙ্গে।

ধরা পড়ার চেয়েও তার নাক ডাকার কথা শুনেই সে বেশি মর্মাহত হয়ে পড়ল!

লোকটি তাকে নিয়ে এল একটা ঘরে। ভেতরে ঢুকে সেই দরজার ছিটকিনি আর খিল, দুটোই লাগিয়ে দিল।

একটা নেয়ারের খাটে চাদর-বালিশ পাতা বিছানা ছাড়া ঘরে আর কোনও আসবাব নেই। সেই খাটের নীচ থেকে সে বার করল—একটা দিশি মদের বোতল আর নোংরা মতন দেখতে একটা কাচের গেলাশ। সেই গেলাসে প্রায় অর্ধেকটা মদ ঢেলে চুমুক দেবার আগে বলল, কী রে খাবি নাকি?

মানিক বলল, না। আমি খাই না।

সেই লোকটি বলল, খাই না মানে কখনও খাসনি?

মানিক বলল, এ পর্যন্ত কখনও চুমুক দিইনি।

সে বলল, সেটা এমন কিছু গুণের কথা নয়। আমার নাম সুলতান, আমি একটা পাক্কা মাতাল। তবু এই কোম্পানি আমাকে চাকরিতে কেন রেখেছে কেন জানিস? আমার মতন পাখি মারতে আর কেউ পারে না। আজই দুটো বনমুর্গা মেরে এনেছি। যাক সে সব কথা, তুই

সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে বসেছিলি কেন?

মানিক বলল, আমার টিকিট নাই। টিকিট কাটার পয়সাও ছিল না।

সুলতান বলল, আহাম্মক কোথাকার! টিকিট ছাড়াই এ জাহাজে উঠতে পেরেছিস, নামার সময় আর তো টিকিট দেখাতে লাগে না। মাঝ সমুদ্দুর থেকে কেউ তো আর উঠবে না। তোর টিকিট কাটার পয়সা নেই, তাহলে যেখানে যাচ্ছিস, সেখানে তোর মাসি-পিসি কেউ আছে?

মানিক বলল, না, কেউ নাই। আমরা শেষ পর্যন্ত যাব কোথায়?

গেলাসের পানীয় দু'চুমুকে শেষ করে, আবার খানিকটা ঢেলে সুলতান বলল, এবারে কোথায় আমরা সবাই নামব? মনে কর, একটা বিরাট চেহারার জন্তু এক জায়গায় মাটিতে শুয়ে আছে, মনে হয় ঘুমন্ত। কোনও মানুষ যদি তার কাছাকাছি এসে পড়ে, তখনই সে একটা লম্বা জিভ বার করে সেই মানুষটাকে মুখের মধ্যে টেনে নেয়। টিকিটিকিরা যেমনভাবে পোকা-মাকড় ধরে। ও আবার ঘুমোবার ভান করে থাকে। সেই জন্তুটার নাম জানিস? তার নাম কলকেতা। শহর কলকাতা!

মানিক প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, অ্যাঁ, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি? ওরে বাবা রে!

সুলতান বলল, আরও একটা মজার কথা শুনবি? আমি এমনও মানুষ দেখেছি, যারা ইচ্ছে করে এই জন্তুটার পেটের মধ্যে যেতে চায়। হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করে। তারপর ওর পেটের মধ্যে গিয়ে আর ফিরে আসতে চায় না।

মানিক সুলতানের হাত চেপে ধরে বলল, ওস্তাদ, তুমি কি সত্যি বলছ যে, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি? সত্যি?

সুলতান বলল, সত্যি ছাড়া তোকে আমি মিথ্যে কথা কেন বলতে যাব রে শুয়োর ব্যাটা? তুই কোথায় যেতে চাইছিলি?

মানিক বলল, বড়জোর বাগের হাট কিংবা যশোর। কলকাতা আমার স্বপ্ন, কিন্তু এখন সেখানে যাবার মতো রেস্তোই নেই। ওখানে গিয়ে কি আমি না খেয়ে মরব?

সুলতান বলল, এই শহরের এই একটামাত্র গুণ, সেখানে কেউ না খেয়ে মরে না। ওখানে একটা এলাকার নাম চোরবাজার। আর আছে চোরবাগান। তুই এর নাম শুনেছিস আগে? শুনিস নাই। ওখানকার মানুষই এই নাম রেখেছে। লোককে জিজ্ঞেস করে করে পৌঁছে যাবি সেখানে। তারপর খোঁজ করবি মল্লিক বাড়ি কোথায়। ব্যস, শুধু এই দু'টি নাম মনে রাখবি, চোরবাগান আর মল্লিক বাড়ি। তোকে আমি আমার ঘরে ডেকে আনলাম কেন রে?

মানিক বলল, তা তো আমি জানি না। কিন্তু আপনি আমার যা উপকার করলেন—

সুলতান বলল, উহুঁঃ। উপকার করার জন্য তো তোকে আনিনি। একটা কী যেন মতলব ছিল, মনে নেই তো। এই হয়েছে এক জ্বালা! ঠিক আছে, যা। কিংবা বসে থাক এখানেই। কলকেতার জাহাজঘাটায় পৌঁছে যাব একটু পরেই।

এক সময় ঘটাং ঘট শব্দ শুরু হয়ে গেল। সুলতান টলমলে পায়ে বেরিয়ে গেল, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, জাহাজ থামলেই তুই আগ বাড়িয়ে নামতে যাস না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর গেটের কাছে যাত্রীদের ভিড় জমে গেলে তার মধ্যে মিশে যাবি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। যদি বা কেউ করে, খবরদার আমার নাম উচ্চারণ করবি না।

ভিড়ের মধ্যে মিশে লঞ্চ থেকে নামার সময় মানিক কোনও বাধাই পেল না। কলকাতার মাটিতে পা দিতে পেরেছে, তার একটা অনুভূতি ধকধক করছে বুকের মধ্যে। এই কলকাতায় সে কতবার আসতে চেয়েছিল, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজি হয়নি। এখন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে গিয়ে সে বাঁচবে কী করে!

সে মন্ত্র পড়ার মতো মনে মনে জপ করে যাচ্ছে, চোরবাগান আর মল্লিক বাড়ি।

এই বন্দর এলাকাটা বেশ ছোটখাটো, কলকাতার মতন এক বিশাল শহরের এটাই প্রবেশদ্বার, এটা মন মানতে চায় না। আসলে সেই প্রবেশদ্বার এখান থেকে অনেকটা দূরে, এটা নৌকো, ছোট ছোট লঞ্চ আর স্টিমারের জন্য।

বন্দর এলাকার বাইরে এসে একজন লম্বা-চওড়া মানুষকে সে জিজ্ঞেস করল, দাদা, এখানে চোরবাগান কোন পথ দিয়ে যেতে পারব, বলবেন একটু।

সেই লোকটির হাতে একটা চায়ের ভাঁড়, সে বলল, চোরবাগান, সে আবার কোথায়?

সে চায়ের দোকানের মালিকটিকে বলল, চোরবাগান বলে কিছু এখানে আছে নাকি? বাপের জন্মে এ নাম আমি শুনিনি।

তারপরই দু'জনেই হাসতে লাগল।

মানিক ভয় পেয়ে গিয়ে ভাবল এই রে, নামটা সে ভুল বলল নাকি? চোরবাগান না চোরবাজার? চোরগঙ্গা?

আরও দু'জনকে জিজ্ঞেস করে সে প্রায় একই উত্তর পেল। নৈরাশ্য এসে ভর করল মানিকের মাথায়। কলকাতা তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে!

মানিকদের গ্রামে জমিদারদের বাড়িটাই একমাত্র পাকা বাড়ি, কাছাকাছি অন্য অনেক গ্রামেই পাকা বাড়ির সংখ্যা অনেক কম। আর এখানে পরপর দোতলা, তিনতলা বাড়ি, একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি। রাস্তাটাও বেশ চওড়া। এরকম রাস্তায় যে জীবনে প্রথমবার হাঁটে তখন তার মনে যে-আন্দোলন হয়, তা বোঝা অন্য কারওর পক্ষে সম্ভব নয়।

এই রাস্তার দু'পাশে কোনও কোনও বাড়িতে আছে দোকানঘর। আর একটা টিনের পাতে লেখা আছে সেই দোকানের নাম আর রাস্তার নাম। সেগুলি পড়তে পড়তে যাচ্ছে মানিক, আর খিদেও বেড়ে যাচ্ছে। এই ক'দিন কুলিগিরি করে সে কয়েকটা পয়সা জমিয়েছিল, তাও সে ফেলে এসেছে তার আস্তানায়। এর জন্য মানিক আফসোসের আগুনে এতই দগ্ধ হতে লাগল যে, তার নিজেরই ইচ্ছে হল নিজের গালে চড় মারতে।

একটা দোকানের ওপরের টিনের পাতটা দেখে সে থেমে গেল। তারা মা দশকর্ম ভাণ্ডার। মালিক অশোক পেৎদার। চোরবাগান রাস্তা।

সত্যিই চোরবাগান লেখা আছে কিনা তা দেখার জন্য সে ছুটে গেল সেই দোকানটার কাছে। না, তার চক্ষু খারাপ হয়নি, দূর থেকে সে ঠিকই দেখেছে।

এর পরে সে আরও দেখল তিনটি দোকানের মাথাতেও লেখা আছে ওই ঠিকানা। মল্লিক বাড়ি পেতেও কোনও অসুবিধে হল না। অবশ্য মল্লিক বাড়ি নিছক বাড়ি তো নয়, এক বিশাল প্রাসাদ। সে প্রাসাদ এতই সুন্দর যে, মনে হয় স্বপ্নের, স্বর্গের বাড়ি।

সামনে একটা পরিচ্ছন্ন বাগান, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি। সুলতান তাকে এখানে আসতে বলেছে কেন? এমন বাড়ি, এমন বাগান, তা মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, কিন্তু তাতে তো পেটের খিদে মেটে না!

একটু পরে সে শুনতে পেল সেই প্রাসাদের পেছন দিকে কিসের যেন গোলমাল হচ্ছে, অনেক মানুষের গলার আওয়াজ। মানিক দ্রুত পায়ে চলে গেল সেদিকে।

সেখানে সে দেখল, বহু মানুষ লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। কারওর অঙ্গে একটি নেংটি ছাড়া কিছু নেই। কেউ আবার গায়ে কম্বল জড়িয়ে আছে, কারওর পা খোঁড়া। এরা সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষ। অবশ্য ভদ্দরলোকদের মতন জামা কাপড় পরা মানুষও আছে কিছু।

মানিক এই লাইনের সামনের দিকে কী আছে তা দেখার জন্য এগোতেই কিছু লোক রৈ রৈ করে উঠল, দিতে লাগল কুৎসিত গালি। লাইন ভেঙে দু'জন লোক মানিকের গলায় ধাক্কা দিতে দিতে ফেলে দিল মাটিতে।

মানিক কী যে দোষ করেছে, তা সে বুঝতেই পারল না। সেই দু'জন লোক তার পা ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে এল একেবারে লাইনের পেছন দিকে। তারপর একজন তাকে একটা লাথি মেরে বলল, শালা, ফের যদি চোরামি করতে যাস, তা হলে তোর মাজা ভেঙে দেব।

মানিক উঠে দাঁড়াল। বাঙালিদের এরকম একের পর এক দাঁড়াতে

তো সে আগে কখনও দেখেনি। তারা তো এক সঙ্গে কয়েকজন এলে নিজেদের মধ্যেই চিলুবিলু শুরু করে দেয়।

তার ঠিক সামনের লোকটি বোধহয় কোনও সাধু দলের লোক। মাথায় একটা গেরুয়া পট্টি বাঁধা।

সে মুখ ফিরিয়ে বলল, এই বিল্লির পো বিল্লি, তুই আবার আমাদের ডিঙিয়ে নেপোর দই মেরে দিতে চাইছিলি?

মানিক হাত জোড় করে বলল, দাদা, আমায় ক্ষমা করুন। আমি কিন্তু এখানে আগে কখনও আসি নাই। বিশ্বাস করেন, আসি নাই। আমি এখনও জানি না, এত মানুষ কেন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে একটু সাহায্য করেন দাদা।

এবার সে লোকটি একটু নরম হয়ে বলল, এখানে বিনা পয়সায় খিচুড়ি দেয়, তা তুই জানোস না?

মানিক বলল, খিচুড়ি দেবে? বিনা পয়সায়? কেন দেয়?

লোকটি বলল, তা জেনে তোর লাভ কী? তোর পেট ভরল কি না, সেটাই তো আসল কথা। এখানকার খিচুড়ির সোয়াদ খুব ভাল। তবে এর মধ্যেও ঘাপলা আছে। দ্যাখ কী হয়!

লাইনটা এগোচ্ছে আস্তে আস্তে। একসময় মানিক দেখতে পেল, একটা তারে ঘেরা ঘরের মধ্যে বসে দু'জন লোক লাইনের লোকদের একটা করে চাকতি দিচ্ছে, সেটা পেয়েই লোকটি প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে একদিকে। সেখানে অনেকে খেতে বসে গেছে।

একটু পরেই আবার একটা শোরগোলে ভেঙে গেল সেই লাইন।

মানিক আগের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, এখন কী হল দাদা?

সে বলল, আজ আর হবে না। বাড়ি যা!

মানিক বলল, কেন হবে না? আমরা কী অন্যায় করেছি?

লোকটি বলল, এখানে যদি হাজার হাজার লোক এসে পড়ে, তাদের সবাইকে খাবার দেবার ব্যবস্থা কি সম্ভব? সেই জন্য ঠিক ১২০০ লোককে খাবার দেবার ব্যবস্থা হয় রোজ। তার বেশি হয়ে গেলে বাকিরা পেটে কিল মেরে থাকে। কিংবা বাড়ি গিয়ে খুদ-কুঁড়ো কিছু আছে কিনা দ্যাখে।

বাড়ি? মানিকের কোথায় বাড়ি? কোথায় যাবে সে?

সে একটা দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। অন্যরা যা খাচ্ছে, সেদিকে চোখ চলে যাবেই। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ দেখছে অন্যদের পেট ভরে খাওয়ার দৃশ্য, এর চেয়ে হৃদয়হীন শাস্তি আর কী হতে পারে?

সবাই খাবার শেষ করে উঠে গেল, মানিক তবু দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। কোথায় সে যাবে, তা এখনও ঠিক করতে পারেনি।

একটু পরে এল দু'জন সাফাইওয়ালা।

তারা এঁটো কলাপাতা, শালপাতা, মাটির গেলাস, এই সব পরিষ্কার করে ফেলবে আজ রাতেই। কাজ শুরুর আগে তারা দু'জনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। এদের বয়েস খুব বেশি নয়, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে।

তাদের একজনের চোখ পড়ল মানিকের দিকে। সে জিজ্ঞেস করল, কী রে এখনও খাড়াইয়া আছস ক্যান, তুই বুঝি আইজ খিচুড়ি পাস নাই?

মানিক মাথা নাড়ল দু'দিকে।

সেই লোকটি বলল, আইজ তো আর কিছু পাবিও না। যা বাড়ি যা।

মানিক জিজ্ঞেস করল, ভাই, এখানে কি প্রতিদিনই খিচুড়ি দেয়!

সে বলল, প্রায় প্রতিদিনই বলা যায়, হপ্তায় একদিন শুধু বন্ধ থাকে। শনিবার! সেদিন আমাগোও ডিউটি থাকে না। আর যদি রবিবার আসতে চাস, তাহলে সকাল ছয়টার মধ্যে আইস্যো লাইন দিবি।

লোকটির কথায় খোঁচাখুচি নেই, বরং কিছুটা সহৃদয়তার আভাস আছে। তাই মানিক বলে ফেলল, ভাইডি, আমার খুব ক্ষুধা পাইছে। পয়সাকড়িও নাই। আর কোনও বাড়িতে এইরকম বিনা

ড্রপ দ্যাট স্টোন, রেইজ ইয়োর হ্যান্ড, স্ট্যান্ড স্টিল, আদার ওয়াইজ উই উইল শুট ইউ!

পয়সায় কিছু খাদ্য দেয়?

নাঃ। অন্তত আমরা শুনি নাই। তোর যদি এতই ক্ষুধা পেয়ে থাকে, তুই একটা কাম করতে পারস। এই সব পাতাগুলোতে দ্যাখ, কেউ কেউ সবটা শেষ করতে পারে না, কিছুটা পড়ে থাকে। তুই সেইগুলো তুলে তুলে খা, তবু তো কিছুটা পেট ভরবে।

অন্য লোকটি বলল, ধ্যাৎ! তুই ওকে কী পরামর্শ দিচ্ছিস! ওকে দেখলেই তো বোধ হয় ও একটা বিদেশি আর ভদ্দরলোক। সে খাবে ওই সব এঁটো পাতা! তার থেকে...আর একটা কাজ করা যায়। ও যদি দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে, আমার সাফাই-এর কাজ শেষ হলে ওকে আমার ঘরে নিয়ে যাব। আমার এক পিসি আমার জন্য ভাত রান্না করে রাখে। আমরা দুইজনে মিলে ভাগাভাগি করে সেই ভাত খাব। জানো দাদা, এক ক্ষুধার্তের সঙ্গে অন্ন ভাগাভাগি করে খেলে সেই অন্নের স্বাদও অনেক ভাল হয়ে যায়। আহা, যেন অমৃত।

প্রথম লোকটি বলল, আমরা শুদ্দুর। শুদ্দুরেরও অধম। বামুন-কায়েতরা আমাগো ছোঁয় না। ছায়া পড়লেও আমাগো দোষ। এই ভদ্দর লোকটি কি তোর ভাগের অন্ন খাবে? এর কী জাত, জিজ্ঞেস করেছিস?

জিজ্ঞেস করার আগেই মানিক এমন কিছু কথা বলল, যা সে সচরাচর বাইরে বলে না। পেটের খিদে তাকে দার্শনিক করে তুলছে।

সে বলল, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তার মধ্যে কোন জাতের মানুষ সবচেয়ে বেশি? যারা দু'বেলা খেতে পায় না, যারা গরিব, গরিবদের কি কোনও জাত-ধর্ম থাকে?

প্রথম লোকটি বলল, গরিবদের জাত-ধর্ম নাই? আছে, অবশ্যই আছে। আমাদের শুদ্দুর-মুগধুররা জানেই না, তারা হিন্দু কিনা। সারাজীবন যে বামুন-কায়েতের লাথ্থি আর ঝেঁটার বাড়ি খেতেই হবে, তা তারা জন্ম থেকেই জানে। এই গত শুক্কুরবার কী হইল জানেন? তিনশত বত্রিশ জন শুদ্দুর একসাথে গিয়ে মোছলমান ধম্ম মেনে নিল। ওনাদের ধম্মে নাকি বামুন কায়েত নাই। সক্কলডিই সমান। আরও কিছু লোক কেরেস্তান হয়ে গেল, ওনাদেরও নাকি বামুন কায়েত নাই। তাতেও হিন্দু বড়কত্তাদের কোনও হেলদোল নাই। আমিও ভাবছি মোছলমান হয়ে যাব। আর কয়েকটি দিন দেখি।

মানিক জানতই না যে, সামান্য এক অশিক্ষিত সাফাইওয়ালা এমন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কথা বলতে পারে। সে তো দেখেছে শুদ্দুররা সবসময়ই মাথা নুইয়ে হাত জোড় করে থাকে।

মানিক বলল, তোমাদের নাম কী ভাই? আমার নাম মানিক।

সে বলল, আমার নাম উল্লু আর ওর নাম ভল্লু। কেমন, এ নাম তোর পছন্দ হয়?

মানিক বুঝতে পারল, এই নাম ওই ছেলেটি এইক্ষণেই বাছল। আসল নাম কোনও কারণে জানাতে চায় না।

সে বলল, নামের আবার পছন্দ-অপছন্দ কী? কিছু একটা নাম ধরে ডাকতে ডাকতেই সেটা একসময় পাকা হয়ে যায়।

যার নাম ভল্লু সে বলল, আরে আর কখন কাম শুরু করবি। এর পর যে রাত ভোর হয়ে যাবে। মানিক, তুই বসে থাক, কাজ শেষ হলেই তোকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

মানিক কাছে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ওরে ভাইডি, তুমি যে আমাকে বললে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে, তোমার অন্ন আমাকে ভাগ করে খেতে দেবে সে জন্য আমি সারাজীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু এমন ক্ষুধা পাইছে যে, বোধহয় এবার অজ্ঞান হয়ে যাব। তিন-চার ঘণ্টা...পারব না, আমি বরং এখন এঁটো পাতায় যা পাই তাই খেয়ে নেই, তাতে যদি জানটা বাঁচে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ছুটে গেল সেই দিকে। এখানে সবাই কলাপাতায় খায়। কোনও কোনও পাতা একেবারে চেটেপুটে সাফ করা, কিছু পাতায় লেগে আছে সামান্য খিচুড়ি। পরিবেশনের সময় কিছুটা পড়েছে পাতার বাইরে, ঘাসের ওপর।

মানিক হাঁটু গেড়ে বসে সেই খিচুড়ি তুলে তুলে খেতে লাগল।

কুকুর-বিড়াল, কাউয়ারা চেল্লামেল্লি করছে খানিকটা দূরে। একজন মানুষকে তাদের এঁটো-কাটায় ভাগ বসাতে আগে কখনও দেখেনি। ওখানে খাদ্য বেশি আছে ভেবে তারা এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে।

কুকুরটা হিংস্রভাবে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগল মানিককে। বিড়াল দেখানো-টেখানোর ধার ধারে না, সে সরাসরি মানিকের সংগ্রহ করা কিছু খিচুড়িতে মুখ দিয়ে চাটতে লাগল। আর কয়েকটা কাক ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়ার সুযোগ খুঁজছে।

মানিক একহাতে কুকুরটাকে আটকে রেখে, বিড়ালটাকে পা দিয়ে সরিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নিতে চায়। কিন্তু কুকুরটাকে আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, সে লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে আসতে চাইছে। বিড়ালকে বারবার লাথি মারলেও সে সরে না। আর কাকগুলো এর মধ্যে একবার ভাগ বসাতে পেরেছে।

বেড়ালের মুখ দেওয়া খাদ্য তাদের বাড়িতে ফেলে দেওয়া হত, মানিক তা দেখেছে অনেকবার। এখানে তা ফেলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না, বিড়াল আর মানুষ একই খাবার কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর শেষ একটা গেরাস হাতে নিয়ে নিজে খেয়ে নেবার বদলে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর খিদে যেন আমার চেয়েও বেশি মনে লয়। তুই তবে এইটা খা।

খানিকটা দূরে ঘাসের ওপরেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মানিক। অনেকক্ষণ পরে সে দেখল আকাশ। সে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে পড়ে মহাশূন্যের কথা, যেন সেখানে সে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার এও মনে হয়, মহাশূন্যে হারিয়ে যাবার সঙ্গে নিজের বিছানায় শুয়েও হারিয়ে যাবার কি কোনও তফাত আছে?

ছয়

ছাদের পাঁচিলে বসে একটা কাক অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রীভাবে ডেকে চলেছে। শুনতে শুনতে একসময় সারা শরীরে রাগ জ্বলে ওঠে। মানিক টেবিল ছেড়ে উঠে এসে কয়েকটা সিঁড়ি নীচে নামে। হুস হুস বলতে বলতে এগিয়ে যায় কাকটার দিকে। সে ভয় পায় না, গ্রাহ্যও করে না। মানিক একেবারে কাছে গেলে কাকটা উড়ে যায় বটে, কিন্তু যেন মানিককে উপহাস করার জন্যই সে সিঁড়িটাতে গিয়ে বসে। এই হচ্ছে শহুরে কাক, এদের চোখ দেখলেই বোঝা যায়, এরা সবসময়ই কিছু না কিছু কুমতলব আঁটছে। এদের বুদ্ধিও বেশি, সাহসও বেশি।

মানিক তাদের গ্রামে যে-সব কাক দেখেছে, তারা আকারে একটু বড়, একেবারে কুচকুচে কালো। শহুরে কাকেরা একটু ছোট, আর তাদের ঘাড়ের কাছে কিংবা পেটের নিচে এক এক সময় কিছুটা সাদা ছোপ দেখা যায়।

এখানে চিলও অনেক। এই সব চিলেরা একসময় আকাশের এত ওপরে উঠে যায়, মনে হয় যেন একটা ফুটকির মতন। আবার হু-হু করে খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসতেও পারে। এই তো পরশুদিন বেশ সকালে মানিক ছাদে হাঁটছিল, আচমকা একটা চিল তার মাথায় একটা ঠোক্কর দিল। মানুষকে আক্রমণ করে, চিলের এত সাহস? কাছাকাছি ওদের বাসা, তার মধ্যে সদ্য ডিম ফোটা বাচ্চারা থাকলে মায়েরা অন্য কারওকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কিন্তু এখানে তো সেরকম বাসা-টাসাও নেই। তবে?

ঘটনাটা শুনে ভোলাডাক্তার বলেছিলেন, ঘর থেকে বেরোবার সময় হাতে একটা লাঠি রাখবি। আর এক-একবার লাঠিটা মাথার ওপর ঘোরাবি, তাতেই আর চিল আসবে না।

ছাদের ওপরে এই ঘরটায় মানিক এখন বন্দি। সে খাবার-দাবার পেয়ে যায়, কিন্তু নীচে নামবার অনুমতি নেই তার। ছাদের দরজাটা ভেতর থেকে তালাবন্ধ থাকে। কখনও কখনও কেউ সেই তালা খুলে ছাদে আসে, তারা কেউ মানিকের সঙ্গে কথা বলে না।

এই ঘরটায় আছে একটা চৌপাই, আর একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। মানিককে সেই টেবিলে বসে সারাক্ষণ পড়া-লেখা করতে হয়। অন্তত সাড়ে তিন মাসের আগে তার ছুটি নেই।

লক্ষঘাটা থেকে মানিক বেরিয়ে এসে চার-পাঁচ দিন কাটাল একেবারে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কুকুর-বিড়াল-ভিখিরিদের সঙ্গে মারামারি

করে উচ্ছিষ্ট অন্নের ভাগ নেওয়া আর খোলা জায়গায় শুয়ে থাকা। যখন-তখন বৃষ্টিতে ভেজার জন্য তার শরীর বেশ রসস্থ হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারে মানিক। এখানে কিছু বাড়ির সামনে রোয়াক আছে, সেখানে কিছুক্ষণ বসলেই বাড়ির মালিক বেরিয়ে এসে রাঙা চোখে বলে, এই এই, যাঃ, এখানে থেকে যাঃ, নইলে লাঠির বাড়ি খাবি! যত্তসব পাগল-ছাগল! এইভাবেই জীবন কাটবে?

এই শহর সম্পর্কে কত না স্বপ্ন দেখেছে মানিক, এখন সে ভাবছে কীভাবে এখান থেকে পালানো যায়। নৈরাশ্যে ভুগতে ভুগতে মানিক এমন একটা জায়গায় চলে এল, যেখানে মনে হয়, আত্মহত্যাই একমাত্র মুক্তির পথ। একদিন সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখল, একটা বড় বাড়ি থেকে হুড়মুড় করে অনেক ছেলে বেরিয়ে আসছে। তাদের সবাই খাঁকি হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরা। ওঃ হো, এটা তো একটা ইস্কুল! কী সুন্দর দেখাচ্ছে এই ছেলেগুলিকে, উঁচু ক্লাসের কিছু ছেলে মানিকেরই সমবয়সি বলে মনে হয়।

হঠাৎ চোখে জল এসে গেল মানিকের। মনে মনে হাহাকার করে বলতে লাগল, হে ভগবান, আমি কেন এমন একটা ইস্কুলে পড়াশুনো করার সুযোগ পেলাম না? কী পাপ করেছি আমি?

সেই দিনই বিকেলবেলা আবার হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেল মানিক যে, কিছু কিছু দোকানের ঠিকানা লেখা, রামবাগান। সেটা দেখেই মানিকের মনে পড়ে গেল, একটা নাম, ভোলা!

গ্রামের মানুষের মধ্যে কখনও কলকাতার প্রসঙ্গ উঠলেই, কেউ কেউ কলকাতা যে কত ভয়ঙ্কর জায়গা তা বোঝাবার জন্য বলে উঠত, কেন, আমাদের ভোলা রামবাগানে এক বেশ্যার কাছে কেনা-চাকরের মতন হয়ে আছে। অর্থাৎ কামরূপ-কামাখ্যায় যেমন ডাকিনীরা পুরুষদের ইচ্ছে মতন ছাগল কিরা গরু বানিয়ে দেয়, সেইরকমই কলকাতার বেশ্যারা এক একজন পুরুষ-মানুষকে গিলে খেয়ে নেয়।

নইলে এত গুণবান, জমিদারের ছেলে, তার ওই অবস্থা হবে কেন? নিজের বাপ-মাকে সে ভুলে গেছে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সে আর ফিরল না।

ভোলার পুরো নামটা কী, তাও জানে না মানিক। কতকাল আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, সে সম্পর্কেও তার কোনও ধারণা নেই। এ রকম ঘটনা যদি সত্যিও হয়, তা হলেও কি তিনি এতদিন থাকবেন এ পল্লিতে? শুধু ডাকনাম জেনে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভবই মনে হয়।

যদি কোনওক্রমে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়, এই ক্ষীণ আশায় ওই অঞ্চলে দু'দিন ঘোরাঘুরি করল মানিক। ঝড়-বাদলের রাতে একটা প্রদীপশিখা অতি সাবধানে বাঁচিয়ে রাখার মতন এই আশা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলা সে দেখল, একটা বাতিস্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তিনটি যুবক। তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানিক শুনতে পেল, ওরা কথার মধ্যে দু'বার উচ্চারণ করল ভোলাবাবা নামের কোনও মানুষের কথা।

মানিকের মনে হল, এই ভোলাবাবা অন্য লোক, তবু একবার যাচাই করে দেখা যেতে পারে। সে যুবকদের জিজ্ঞেস করল, দাদা, ভোলাবাবা কোথায় থাকেন, তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা করা যায়?

একজন যুবক বলল, কেন দেখা করা যাবে না? ওই লোহার গেটওয়ালা বাড়িটার মধ্যেই ওঁর চেম্বার। হ্যাঁ, এই সময়ই তিনি বসেন।

সে বাড়ির ভিতর দিকে একটা লম্বামতন ঘরে গোটা পাঁচেক বেঞ্চি পাতা, তাতে বসে আছে আট-দশজন স্ত্রীলোক, আর টেবিলটির ওপাশে বসে আছেন এক জবরদস্ত পুরুষ। বেশ সুপুরুষ, লম্বা-চওড়া চেহারা, গৌরবর্ণ, মাথায় বাবরি চুল। তিনি পরে আছেন একটা গেরুয়া লুঙ্গি, আর ওই রঙেরই একটা পিরান। তার মুখের রেখা দেখেই বোঝা যায়, তিনি একজন অহংকারী দীপ্ত চেহারার পুরুষ।

বেঞ্চিতে বসে আছে শুধু কয়েকজন স্ত্রীলোক, তাই মানিক সেখানে বসল না, দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

ভোলাবাবা তখন কথা বলছেন একটি প্রায় মধ্যবয়সি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। তার রূপ তেমন নেই, স্বাস্থ্যও ভাঙা ভাঙা। মুখে মেচেতার দাগ।

ভোলাবাবা বললেন, ওরে ননী, তুই আবার আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছিস! আমি কি টাকার গাছ? তোকে বলেছি না, এখন থেকে রোজ কয়েকটি টাকা জমাবি, নইলে বুড়ি হবার পর বাঁচবি কী করে? আর কয়েক-বছর পরই তোর কাছে আর খদ্দের আসবে না, তখন তোকে এ বাড়ি থেকে হটে যেতে হবে। তখন তোর কাছে যদি টাকার জোর থাকে, তাহলে লোকে তোকে মান্য করবে। আর টাকা না থাকলে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। কিংবা কোথাও দাসী-বাঁদীর কাজ করতে হবে।

ননী নামের স্ত্রীলোকটি খুনখুনে গলায় বলতে লাগল, দেওতা, তুমি আমাকে ট্যাকা জমাতে বলেছিলে ঠিকই। কিন্তু সব টাকাই তো হড়হড়ে নিয়ে নেয়।

এই হড়হড়েটা আবার কে? মানুষ না কোনও জন্তু?

মানুষ গো। লোকে জানে সে আমার নোকর, কিন্তু আসলে সে-ই যেন আমার মালিক। প্রতিদিন আমি যা রোজগার করি, তা ও সব নিয়ে নেয়। তারপর কী সব হিসেব-নিকেশ করে আমাকে দু'পাঁচ টাকা ফেরত দেয়। কোনও কোনওদিন তাও দেয় না। চাইতে গেলে মারে। আসলে প্রতি মাসে তো বাড়িতে কিছু টাকা পাঠাই, সেটা এমাসে পাঠাতে পারিনি।

তুই বাড়িতে টাকা পাঠাস? তোর এক কাকা বলেছিল না যে, তুই জীবনে আর কোনওদিন ওই বাড়ির ভেতরে পা দিতে পারবি না!

তা বলেছিল ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে আমার দুটো ভাই ইস্কুলে লেখাপড়া করে, ওদের খরচের জন্য। আমি তো শেষ হয়েই গেছি, তবু ওরা যদি পড়াশুনো করে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে...

কত টাকা পাঠাস?

তিরিশ টাকা, দেওতা! এ টাকা তোমাকে আমি শোধ করে দেব।

ভোলাবাবা বললেন, আবার দেওতা? আমি বলেছি না, আমি দেবতা-টেবতা কিছুই নই। আমি একজন সাধারণ ডাক্তার। বলে ডাক্তার এক হাঁক দিলেন, বাহাদুর, বাহাদুর!

অমনি একটা জানলায় দেখা গেল একজন মানুষের মুখ।

ডাক্তার বললেন, বাহাদুর, তুই হড়হড়ে বলে কারওকে চিনিস?

সে বলল, জরুর চিনি। ওর আর একটা নাম, রামগোলাম।

ডাক্তার বললেন, যেখান থেকে পারিস ওকে এখানে ধরে নিয়ে আয়, এই ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে।

তারপর তিনি মানিককে দেখতে পেয়ে বললেন, এই ছোঁড়াটা আবার কোথা থেকে এল? আগে তো দেখিনি। এদিকে আয়।

মানিক গিয়ে টেবিলটার কাছে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে?

মানিক বলল, হুজুর, আমার নাম মানিকচন্দ্র সীতারাম চৌধুরী। আমি জন্মেছি চিতলমারি গ্রামে, ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছেছি।

তারপর?

তারপর, মানে, এখনও আর কিছু ঠিক নাই।

ডাক্তার টেবিলে এক চাপড় দিয়ে বললেন, তুই একটা গ্রাম থেকে এসে আমাদের ধন্য করেছিস তা তো বুঝলাম! এখানে এসেছিস কী উদ্দেশ্যে? আমার কাছে তোর কিছু দেনা-পাওনা আছে?

মানিক বলল, আজ্ঞে না হুজুর। আমার খুব লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে করে। এ বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে আমার কেউ চেনা নাই, কেউ সাহায্যও করবে না। আপনি যদি দয়া করে কিছু সাহায্য করেন।

ডাক্তার এবার হুংকার দিয়ে বললেন, গেট আউট! উনি লেখাপড়া করতে চান, তাতে আমাদের সাহায্য করতে হবে? এ কি মামাবাড়ির আবদার! এখানে আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত। যা, যা, নিজের পথ দ্যাখ। হুসেন কোথায়, হুসেন?

অমনি জানলার কাছে দেখা গেল একটা দাড়িওয়ালা মুখ।

ডাক্তার বললেন, হুসেন, তুই এই ছোঁড়াটাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে বড় রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়। এই ছোঁড়া, জীবনে আর এ তল্লাটে আসবি না। তোর মুখ যাতে আমাকে না দেখতে হয়।

মানিক ঘরের বাইরে যেতেই হুসেন এসে তার গলায় হাত দিল। তারপর ঠেলতে লাগল নরম ভাবে। যেন সে নিজে আর কোনও শাস্তি দিতে চায় না মানিককে।

এ বাড়ি থেকে বড় রাস্তা খুব বেশি দূরে নয়, আসার সময় মানিক দেখেছে। কিন্তু হুসেন তাকে সেই পথে না নিয়ে চলল অলিগলি দিয়ে। সেখান দিয়ে প্রায় বড় রাস্তায় পা দেবার সময়েই দেখা গেল, কে একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে হুসেনকে, হাত নাড়তে নাড়তে দৌড়ে আসছে এদিকে। মানিক আর হুসেন থমকে দাঁড়াল। কাছে এসে সেই লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ডাক্তারসাহেব মত বদলে ফেলেছেন, তোদের ফিরে যেতে বলেছেন।

হুসেন মানিকের গলা থেকে হাত সরিয়ে নিল। তারপর মানিকের দিকে হাসি মুখে চেয়ে বলল, তুমি বোধহয় এবারের মতো বেঁচে গেলে। ডাক্তার সাহেব কখনও এক ব্যক্তিকে দু'বার শাস্তি দেন না।

সেই চেম্বারে ফিরে এসে দেখা গেল, এর মধ্যেই কয়েকজন স্ত্রীলোক উঠে চলে গেছে। ডাক্তারের সামনে একটা সিড়িঙ্গে চেহারার লোক, তার পাশে বাহাদুর।

এই কি তবে হড়হড়ে? এত তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলেছে বাহাদুর?

ডাক্তার মানিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিতলমারি গ্রাম থেকে এসেছিস বললি না? তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বোস, এখানকার কাজ চুকিয়ে তারপর কথা বলব।

তারপর তিনি সেই সিড়িঙ্গে লোকটাকে বললেন, এখানকার মেয়েছেলেরা গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার করে। তাতে আরামের চেয়ে কষ্টই বেশি। আর তুই বিনা কষ্টে সেই টাকা ভোগ করতে চাস? এইবার দ্যাখ আমি কী করতে পারি।

তিনি তাঁর দু'হাত দিয়ে সেই লোকটির কোমরের দু'দিকে চেপে ধরলেন। তারপর তাকে তুললেন খানিকটা ওপরে। ওর পা দুটো দোদুল্যমান হয়ে গেল। ডাক্তার তাকে ছুড়ে দিলেন আরও ওপরে। আর একটু হলেই ছাদে ওর মাথা ঠেকে যেত। সেখান থেকে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির বুকে ডাক্তার তাঁর জুতোসুদ্ধ একটা পা তুলে দিয়ে বললেন, তোকে আমি এখনই মেরে ফেলতে পারি। তাতে আমার কোনও দোষ হবে না। ডাক্তারদের সাত খুন মাফ। তুই ফের যদি হড়হড়ামি করিস, তা হলে আমাকে সেই দণ্ডটাই নিতে হবে।

লোকটি এতই ভয় পেয়েছে যে, কোনও কথাই বলতে পারছে না, শুধু আঁই আঁই শব্দ করতে লাগল। তারই মধ্যে সে হিসি করে দিল।

তখনই সবাই নাক চেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ডাক্তার বললেন, বাহাদুর, দেখ কোনও সাফাইওয়ালা এখনও আছে কি না। সব পরিষ্কারের ব্যবস্থা কর। এই হারামজাদাকে আর বেঁধে রাখারও দরকার নেই।

মানিককে নিয়ে তিনি উঠে এলেন ছাদের ঘরটায়। সিঁড়িটাতেই বসে পড়ে তিনি বললেন, দ্যাখ, একদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে, আর একদিকে উঠে আসছে চাঁদ। এ দৃশ্য রোজ দেখা যায় না।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চিতলমারি গ্রামে তোর জন্ম, তোর বাপের নাম কী?

মানিক বলল, আজ্ঞে আদিনাথ চৌধুরী।

ডাক্তার বললেন, হুঁ, দেখেছি তাকে। খুব ধুরন্ধর ব্যক্তি। তুই পুণ্যস্নাতা দেখেছিস কখনও?

মানিক বলল, দেখেছি, মাত্র একবার। অমন সুন্দর মানুষ আমি এ পর্যন্ত আর দেখিনি। শুধু তো দেখতেই সুন্দর নয়, কী অসাধারণ মিষ্টি ব্যবহার ছিল তার। তিনি পর্দানশিন ছিলেন না, রাজবাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন।

ডাক্তার বললেন, তিনিই আমার মা।

মানিক অনেকটা চেঁচিয়ে উঠে বলল, আপনার মা? আপনিই তাহলে আমাদের গ্রামের জমিদারের পুত্র?

ডাক্তার বললেন, তখন আমার একটা বিচ্ছিরি নাম ছিল, বিনয়েন্দ্র অমৃতময় দত্ত চৌধুরী। এখন সে নামটা একেবারে মুছে ফেলেছি, সবাই আমাকে ভোলাবাবু কিংবা ভোলাবাবা বলেই ডাকে।

মানিক বলল, স্যার, আপনি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন? গেরুয়া ধারণ করেছেন দেখছি!

ডাক্তার বললেন, না, না ওসব সন্ন্যাস-টন্ন্যাস আমার সহ্য হয় না। আমি ভোগবাদী মানুষ। এই যে গেরুয়া পরি, সেটা ভেক ধরা বলতে পারিস। এখনও সন্ন্যাসী দেখলে মানুষ কিছুটা ভক্তিশ্রদ্ধা করে, যে-কোনও বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই আতিথ্য পাওয়া যায়। রেলের টিকিট লাগে না। আরও মজার কথা কি জানিস? আমি ডাক্তার হিসেবে কারওর চিকিৎসা করলে, ওষুধ দিলে অনেক রোগী ঠিক যেন বিশ্বাস করে না, কিছু কিছু ওষুধ না খেয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু কোনও সন্ন্যাসী জড়ি-বুটি দিলে তা ভক্তিভরে খেয়ে নেয়। তাই আমি দুটো মিলিয়ে দিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছি।

যাক, এবার আসল কথাটা বলা যাক। ওই গ্রামের কাছে একটা ঋণ আছে। ওই গ্রামে আমাদের বাড়ির খুব কাছেই একটা খাল আছে না? তার ওপরে যে-ব্রিজ, সেটা অনেকদিন ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে ছিল, গাড়ি-ঘোড়া তো আর সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারেই না। মানুষও ওর ওপর দিয়ে যেতে গেলে জলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, একজন তো সেখান থেকেই পড়ে মারা গেল। আমার বাবা ইচ্ছে করলেই সে ব্রিজটা সারিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দিচ্ছিলেন না, এর মধ্যে নাকি কী একটা কৌশল আছে। আমার মা বলেছিলেন, ভোলা তুই এখানে একটা নতুন সেতু বানিয়ে দিতে পারবি? পুরাতনটা আর সারাই-সুরাই করে কিছু লাভ নেই।

আমি তখন বলেছিলাম, নিশ্চয়ই নতুন ব্রিজ বানিয়ে দেব, মা।

মা বলেছিলেন, সেটা তুই করবি নিজস্ব রোজগারের টাকায়। এস্টেট থেকে কিছু নিবি না।

আমি সবে মাত্র তখন ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছি, নিজস্ব রোজগার তো ছিল না। আমি পুরোপুরি ডাক্তার হবার আগেই মা চলে গেলেন। এখন সেখানে একটা নতুন ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে, তাই না?

মানিক বললে, হ্যাঁ হয়েছে। আপনার বাবা কিছু করেননি, সরকার করে দিয়েছে।

ডাক্তার বললেন, আমার নামে বাবা কী রটিয়েছেন তা আমি জানি না। আমি কিন্তু ডাক্তারি পাশ করার কয়েকদিন পরেই গিয়েছিলাম গ্রামে। এরকম বড় বড় ঘটনা ঘটলে গুরুজনদের প্রণাম করতে যেতে হয়। তাই প্রথমেই গিয়েছিলাম বাবার কাছে। বাবা আমার প্রণাম নিলেন না। আমি কিছুদিন বেশ্যা সংসর্গ করেছি বলে তিনি ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলেন। আর কাকে যেন ডেকে বললেন, ওরে, এই ছেলেটাকে বলে দে, আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছি। ও আর আমার পুত্র নয়। ও যেন এই গ্রামে আর না আসে! এরপর কি আর ওই গ্রামে যাওয়া যায়?

মানিক বলল, আমরা শুনেছি, আপনি কলকাতায় এসে কীসে যেন বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন, ওই গ্রামের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে চান না। ভুলেই গেছেন সেই গ্রামের কথা।

ডাক্তার বললেন, মানুষ যতই দূরে চলে যাক, তবু কি সে জন্মস্থান ভুলে যেতে পারে? আমার তো এখনও বুকটা টনটন করে। আবার রাগও হয়। ওই গ্রামের মানুষ দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। সেই জন্যই তোর পরিচয় শুনেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তোকে তাড়িয়ে দেবার একটু পরেই আমার মনে হল, আরে ওই ছেলেটার মধ্য দিয়েই আমি মাতৃঋণ শোধ করতে পারি।

মানিক বলল, স্যার, মাতৃঋণ, আমি...আপনি...ঋণশোধ...এসব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন, তুই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চাস বলেছিলি না? আমাদের সেই গ্রামে ম্যাট্রিক পাশ আর কেউ আছে?

মানিক বলল, না স্যার, এখনও নেই।

ডাক্তার বললেন, বেশ! আমরা তোর ওই পরীক্ষার জন্য সবরকম সাহায্য করব, টেক্সট বুক, নোট বুক, সাজেশনস্‌, খাতা-কলম সব এনে

দেব। তারপর তুই পাশ করে বেরিয়ে এলে সেটাই হবে ওই গ্রামের প্রতি আমাদের উপহার, আমার মাতৃঋণ পরিশোধ।

মানিক বলল, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব নিশ্চিতই।

ডাক্তার বললেন, অবশ্য এর মধ্যে আমাদের দু'টি শর্ত আছে। এ পল্লিটা একটা বেশ্যাপল্লি, এই যে বাড়িটাও একটা বেশ্যাবাড়ি। বেশ্যা কাদের বলে জানিস তো?

মানিক বলল, আমার বয়েস এখন উনিশ। এই বয়েসে কি কিছু আর জানতে বাকি থাকে?

ডাক্তার বললেন, অবশ্যই বাকি থাকে। মানুষের যৌবন বয়েসটা বড়ই মোটা দাগের। তখন পর্যবেক্ষণের চেয়ে হই-হল্লাই বেশি ভাল লাগে। যত বয়েস বাড়ে, ততই জীবনের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক চেনা যায়। আমার শর্ত হচ্ছে এই যে, পরীক্ষা শেষ হবার আগে তুই বেশ্যাপাড়ায় একবারও যেতে পারবি না, কোনও বেশ্যার সঙ্গে ভাব জমাতেও পারবি না। মনে থাকবে তো?

মানিক বলল, এসব কথা কি কেউ ভুলতে পারে? এ তো আমার জীবন-মরণের সমস্যা।

ডাক্তার বললেন, তা ঠিক। চল, এবার আমরা খেতে যাই। আমি অবশ্য আগে একটু মদ-টদ খাব, তুই এই সাড়ে চারমাসের মধ্যে একবারও ছুঁবি না।

ডাক্তারের পিছু পিছু কিছুটা হেঁটে মানিক প্রশ্ন করল, স্যার, আপনি তো দ্বিতীয় শর্তটার কথা কিছু বললেন না?

ডাক্তার বললেন, সেটা আরও পরে বলব ঠিক করেছিলাম। এখনই শুনে নে, আমরা সবরকম সাহায্য করার পরও তুই যদি পরীক্ষায় গাড্ডু মারিস, তা হলে তন্দণ্ডেই তোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব। আমি ফাঁকিবাজি একদম সহ্য করতে পারি না।

সেই থেকে শুরু হল মানিকের বন্দি-জীবন। একটা ছোট ঘর, আর একটা ছাদ, তারও কিছুটা অংশ টিনের চালের। এখানে মানিকের কোনও অভাব নেই, তবু এই যে সীমাবদ্ধতা, এটাই তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, সব রকম গণ্ডি ভেঙে তারা বাইরে যেতে চায়।

মানিক পড়াশুনো শুরু করল একাগ্র হয়ে। পাতার পর পাতা সে মুখস্থ করতে লাগল, মাঝে মাঝে সে জোরে উচ্চারণ করে নিজেই নিজের পরীক্ষা নেয়। মাঝে মাঝে আসেন ভোলা ডাক্তার।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী রে, কেমন আছিস? শরীর ঠিক আছে তো?

তিনি মানিকের কপাল ছুঁয়ে, নাড়ি দেখে, মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, হুঁ! ঠিকই তো আছে। তুই এখন কী পড়ছিস? শেক্সপিয়র? কোনটা?

মানিক বলে, এ বছরের সিলেবাসে আছে হ্যামলেট।

ডাক্তার বললেন, সে তো অপূর্ব নাটক। বল তো, মরে যাওয়ার আগে হ্যামলেটের শেষ কথা কী?

মানিক অতদূর পৌঁছয়নি। সে মিনমিন করে বলল, স্যার, খুব শক্ত লাগে। অনেক কথার অর্থও বুঝি না।

ডাক্তার আবৃত্তি করতে লাগলেন, সো টেল হিম, উইথ দা অকারেন্সট, মোর অর লেস, হুইচ হ্যাভ সলিসিটেড,—দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স! মুখস্থ করবি, মুখস্থ করবি, একসময় মানে বুঝে যাবি।

একমাত্র ডাক্তারের মুখদর্শন ছাড়া আর কোনও মানুষও দেখে না মানিক। তবে কয়েকদিন আগে, পাশের, পাশের বাড়ির ছাদে সে দেখতে পেল, একজন তরুণী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে পিছিয়ে আড়ালে চলে গেল।

এতখানি বয়েস হয়ে গেল, তবু এর মধ্যে সে কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তার কেমন যেন ভয়ভয় করে। এই বয়েসে অনেক ছেলেই বিয়ে-থা করে সংসারে ঢুকে যায়। মানিক তা এড়িয়ে গেছে। সেদিনই প্রথম চরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে তার মনে হল, ওই মেয়েটির সঙ্গে দু'চারটি কথা বললে বেশ হত।

এর পরেও মাঝে মাঝে সকালে বা বিকেলে মেয়েটিকে দেখা যায়, স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে এদিকে। কিন্তু একটাও কথা বলে না। একদিন মানিক কিছু বলতে চেয়েছিল, সে অমনি চলে গেল আড়ালে। মানিক এখন তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হতে থাকে। রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে ভাবে, কাল সকালে সে ওকে দেখতে পাবে তো। এই মেয়েটিও কি বেশ্যা?

মানিক একদিন নিজের দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরে, মনে মনে বলল, সাবধান মানিক, ডাক্তার তোমায় শর্ত দিয়েছে, এখানকার কোনও মেয়ের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করতে পারবে না।

তবু মানিক মেয়েটিকে দেখার জন্য অনেকক্ষণ ছাদে বসে থাকে, এখন আর সে কথা বলার চেষ্টা করে না, ওকে চোখের দেখা দেখেই তার খানিকটা বুক জুড়োয়।

পড়াশুনো করার সময় মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তা তো হবেই। মানুষ কতক্ষণ আর একটানা পড়ার মধ্যে ডুবে থাকতে পারে? সেই সময় তার মনে পড়ে যায় অনেক পুরনো কথা।

পালাবার সময় লঞ্চের সিঁড়ির নীচে সে যখন থেকেছে, সেই সময় সে দেখেছিল, অনেকটাই ভাঙা এক মাটির দেবী মূর্তি। সে মূর্তিটা লক্ষ্মী না সরস্বতী, সে ব্যাপারে তার ধন্দ এখনও কাটেনি। সরস্বতীই হবে, কারণ একটা গলাভাঙা হাঁসও ছিল সেখানে। হাঁসই তো সরস্বতীর বাহন, লক্ষ্মীর বাহন তো পেঁচা।

সেই কথা মনে পড়তেই মানিক আবার দেবী সরস্বতীর বন্দনা শুরু করল। হে মা, আমায় বিদ্যা দাও। আমি আর কিছুই চাই না। ধন-ঐশ্বর্য কিছু চাই না, যেন আমি বিদ্যা অর্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। মা, দয়া করো, দয়া করো।

দেবী সরস্বতী নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, তিনি মানিকের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেননি। এবারেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছে মানিক। তবে সব সাবজেক্টে নয়, ইংরিজিতে সে পেয়েছে আট নম্বর কম। ইংরিজিতে ফেল মানে একেবারে ফেল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের কানে এল এই ব্যর্থতার খবর। তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর উঠে এলেন তিনতলায়।

মানিক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সেও নিশ্চয়ই জেনেছে এই দুঃসংবাদ। সে এখন কাঁদছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তার খানিকটা নরমভাবেই বললেন, এই মানিক, ওঠ।

সঙ্গে সঙ্গে মানিক উঠে বসে হাত জোড় করল।

ডাক্তার বললেন, তোকে তো আমি বলেইছিলাম, পরীক্ষায় ফেল হলে তোকে এখনই এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। আমার কথার নড়চড় হয় না। তোর নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র যদি থাকে, তা গুছিয়ে নে। এখনই চলে যেতে হবে তোকে। বেশি সময় নেই, আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

কোনওরকম কাকুতি-মিনতি নয়, স্পষ্ট গলায় মানিক বলল হ্যাঁ, চলে তো যাবই। এখানে আমার নিজস্ব কিছুই নেই। খালি হাতে এসেছি, খালি হাতেই চলে যাব।

ডাক্তার বললেন, এখান থেকে কোথায় যাবি, তা আগে থেকে ঠিক করেছিস কিছু?

মানিক বলল, ঠিক করারই বা কী দরকার! যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই হাঁটব। তারপর কী হয় দেখা যাবে।

সে বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে একবার পড়ে গেল।

ডাক্তার বললেন, তোর চোখ দুটো এত লাল কেন? দেখি তো।

তিনি মানিকের কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠে বললেন, জ্বরে যে তোর গা পুড়ে যাচ্ছে! কখন এই জ্বর বাধালি? আমাকে কিছু জানাসনি কেন? এখন এই সব জ্বর অন্য কোনও শক্ত অসুখকে সঙ্গী করে আনে। তোকে এখন আর যেতে হবে না। শুয়ে থাক।

মানিক দ্বিতীয় চেষ্টায় খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সহজভাবে বলল, না, স্যার, এই জ্বর-টর কিছুই নয়। আমি ঠিকই চলে যেতে পারব। ডাক্তারসাহেব, আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। চুক্তির শর্ত হিসেবে আমি এখনই চলে

যেতে চাই। আপনাকে একবার প্রণাম করতে পারি?

ডাক্তার বললেন, না, পারিস না। বলছি তো তুই আরও দু'তিন দিন এখানে থাকবি। আগের মতন। আমি তোকে ওষুধ দেব, তাতে যদি জ্বরটা নামে...

মানিক এবারে দৃঢ়ভাবে বলল, না, তা সম্ভব নয়। আমি আর ওষুধ-টষুধ খাব না। আমাকে চলে যেতে হবে।

ডাক্তার এবার দপ করে জ্বলে উঠে বললেন, কী, আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুই চলে যেতে চাইছিস! কোনও ডাক্তার তার রুগিকে এরকম ক্রিটিক্যাল সময়ে ছেড়ে দেবে না।

মানিক আরও কিছু বলতে যেতেই ডাক্তার উঠে এসে তার ঘাড় চেপে ধরলেন। তারপর চাপ দিতে দিতে বললেন, কী! মুখে মুখে কথা! যা, খাটে গিয়ে বোস। নইলে আমি তোকে এমন শাস্তি দেব!

সুতরাং মানিককে থেকে যেতেই হল। বাহাদুরের মতন একজনকে রাখা হল সর্বক্ষণ তাকে পাহারা দেবার জন্য।

মানুষের জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, যা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অলৌকিকও মনে হতে পারে। মনে হয় যেন, এই ঘটনার জন্য কোনও অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত আছে।

পরের দিন মানিক প্রায় অজ্ঞান হয়েই রইল। তার পরের দিন অনেকটা লঘু হল মাথা। ফিরে এল তার চিন্তাবোধ। চোখ মেলেই সে শুয়ে রইল বহুক্ষণ।

তারপর শেষ বিকেলে সে শুনতে পেল অনেকগুলি পায়ের আওয়াজ। দরজা ঠেলে খুলে ফেলে উঠে এল দশ-বারোটি রমণী, দু'তিনজন পুরুষ। এদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে ফুলের গুচ্ছ। কেউ কেউ গানও গাইছে। মানিক বুঝলই না, হঠাৎ এসব কী ঘটছে!

একটু পরেই এলেন ডাক্তার, তার সঙ্গে একটি মেয়ে। মানিক চিনতে পারল, এ মেয়েটি তো অন্য ছাদের সেই মেয়েটি, এর সঙ্গে একটাও কথা হয়নি, তবু তাকে খুব আপনজন বলে মনে হল।

ডাক্তার সোল্লাসে বলল, তুই তো কামাল করেছিস রে মানিক। দে, সবাই ওকে ফুল দে।

যাদের হাতে ফুলের তোড়া আছে, তারা সকলেই একসঙ্গে ছুটে এল মানিকের কাছে।

বাহাদুর মানিকের একটা হাত ধরে বলল, কী রে উঠে দাঁড়াতে পারবি না? ওঠ, আমি তোকে ধরে থাকব।

মানিকের শরীরটা সত্যিই এখন নড়বড় করছে, দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই। তবু অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গে সবকটা ফুলের তোড়া তার গায়ে পড়ল।

মানিক ধরা গলায় ডাক্তারকে বলল, স্যার, এসব কী হচ্ছে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

ডাক্তার বললেন, তুই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিস, তুই ম্যাট্রিক পাশও করেছিস। তোদের চিতলমারি গ্রামে তুই-ই প্রথম ম্যাট্রিক পাশ।

মানিক বলল, না স্যার, আপনাদের কিছু একটা ভুল হচ্ছে। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছি, গেজেটে বেরিয়ে গেছে, আর তো আমার পক্ষে পাশ করা সম্ভব নয়।

ডাক্তার বললেন, অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। এবারের পরীক্ষায় ইংরিজির প্রশ্ন খুব কঠিন হয়েছিল, তার মধ্যে দু'জায়গায় ছাপার ভুল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা সেটা বুঝতেই পারেনি, উত্তর লিখবে কী করে? সেই জন্যই ইংলিশে অনেকেই ফেল করেছে। সব মিলিয়ে পাশের পারসেন্টেজও কমে গেছে অনেকখানি। সেই জন্যই ওপরের কর্তাব্যক্তিরা ঠিক করেছেন, একটু থেমে তিনি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ঠিক করেছেন?

সব কটি স্ত্রীলোকই হাত চাপড়ি দিতে দিতে নাচতে শুরু করল। আর গানের মতো সুর লাগিয়ে বলতে লাগল, পাশ করেছে মানিক চাঁদ, পাশ করেছে মানিক চাঁদ।

ডাক্তারও ওদের মধ্যে মিশে গিয়ে নাচতে লাগলেন আর গাইতে লাগলেন, পাশ করেছে মানিক চাঁদ, পাশ করেছে মানিক চাঁদ।

নাচতে নাচতে তিনি মানিকের একেবারে কাছে এসে বললেন, তুই কী করে পাশ করলি? কর্তাব্যক্তিরা ঠিক করলেন, এবারের ইংলিশের পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারেনি তারা সবাই দশ নম্বর করে গ্রেস পাবে। দশ নম্বর, তাতেই তুই উতরে গেছিস। তুই ইতিহাসের পেপারে অনেক নম্বর পেয়েছিস, সে জন্য তুই একটা জলপানিও পেতে পারিস।

এরপর সেই মেয়েদের উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। তারা নাচতে লাগল সারা ছাদ ঘুরে ঘুরে।

এক সময় হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, আমার আর একটা কথা আছে। এই যে মেয়েটি, এর নাম লীলা, ভারি ভাল মেয়ে, ও মানিককে বিয়ে করতে চায়। কী রে মানিক, তুই রাজি?

অন্যসময় হলে মানিক না, না বলে চেঁচিয়ে উঠত। বিয়ের বন্ধনে তো সে যেতে চায় না। কিন্তু এখন সে কিছুই বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইল লীলার দিকে।

ডাক্তার বললেন, তুই এক্ষুনি কিছু সিদ্ধান্ত না নিতেও পারিস। আজকের রাতটা ভেবে দ্যাখ।

তখন একজন মধ্যবয়েসি স্ত্রীলোক বলল, ঠাকুর, আমি দু'একটা কথা বলতে পারি?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল, বল।

স্ত্রীলোকটি বলল, এ মেয়ের বাপ নাই, মা নাই। যখন ওর মাত্র দুই মাস বয়েস তখন কে যেন ওকে এখানকার আদাড়ে ফেলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ওকে উদ্ধার করে আনে শেফালি, ওই যে শেফালি দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। শেফালি ঠিক নিজের মেয়ের মতন যত্নে ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে। এখন ও ডাগর হয়েছে, এই সময়ই তো ওর কাজ-কাম শুরু করার কথা। কিন্তু ও কিছুতেই তাতে রাজি নয়। ওর ওপর কেউ জোর করতে এলে আমরা তাকে খ্যাংরাপেটা করি।

ঠাকুর, আমরা সব পাপী-তাপী, এই একটা মেয়ে যদি নিষ্পাপ থাকতে চায়, তাই থাকুক না।

ডাক্তার বললেন, কে বলেছে তোরা পাপী-তাপী? কক্ষনও এ কথা ভাবিস না। তোরা গায়ে খেটে রোজগার করছিস।

সেই স্ত্রীলোকটি মানিকের দিকে চেয়ে বলল, ঠাকুর, তুমি ওকে নাও। যদি আমাদের কথা না গেরাহ্য করো, তবে পরে পস্তাবে।

ডাক্তার বললেন, ঠিকই তো। কী রে মানিক, এখনও চুপ করে আছিস কেন? চুপ করে থাকা মানেই তো রাজি হওয়া, তাই না?

এ কথা শুনে দু'তিনজন হাসতে লাগল মাথা নেড়ে নেড়ে। এর মধ্যে কী হাসির উপাদান পেল, তা বোঝা যায় না।

ডাক্তার বললেন, মিঞা বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি? ওরে তোর কেউ দুটো মালা নিয়ে আয় না।

বাহাদুর বলল, মেরে পাস হ্যায়।

সে তার ঝোলা থেকে বার করে দিল দুটো গোড়ের মালা। ডাক্তার লীলাকে বললেন, তুই এই একটা মালা ওকে পরিয়ে দে আগে।

মানিক বাধ্য ছেলের মতন মাথাটা এগিয়ে দিল। তারপর ডাক্তারের নির্দেশে সেও একটা মালা পরিয়ে দিল লীলার গলায়।

এরপর আরও প্রবল হাততালি, উদ্দাম নৃত্য ও গান চলতে লাগল। এ বাড়িতে এমন আনন্দ উৎসব আগে কখনও হয়নি। হয়তো এইভাবেই কেটে যাবে সারা রাত।

সাত

মানিকের কাহিনি এখানেই থেমে যেতে পারে।

অনেকে বলে, লেখকদের ক্ষমতা অনেকটা ভগবানের মতন। তাঁরা ইচ্ছে করলেই কোনও ফকিরকে বাদশা বানাতে পারে, কোনও বাদশাকে ফকির।

আসলে কিন্তু লেখকদের সে ক্ষমতা নেই। প্রত্যেক গল্পেরই একটা নিজস্ব গতি ও যুক্তি থাকে। তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এখনও বহু মানুষ আছে, যারা কুটিল নয়, ষড়যন্ত্রে মত্ত থাকে না, বরং অন্যের দুঃখে কাতর হয়, কিছু না কিছু সাহায্য করতেও চায়। সেই

জন্যই আকাশে দিনের বেলায় দেখা যায় সূর্য, রাত্তিরে চন্দ্র-তারা। অনেক কাহিনিই শেষ হয় দুঃখবোধে, মন অবসন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এ কাহিনি তো শেষ হচ্ছে আনন্দের আভরণে। অনায়াসেই বলা যায়, অ্যান্ড দেন দে লিভ্‌ড হ্যাপিলি এভার আফটার।

তবু আমাকে আর একটা ছোট ঘটনার কথা বলতেই হবে। এতে আর একটি সত্য জাজ্বল্যমান।

লীলার সঙ্গে মানিকের বিয়ের কয়েকটা দিন খুব উচ্ছ্বাস ছিল। তারপর সব কিছু থিতু হলে ডাক্তার একদিন মানিককে ডেকে বলেছিলেন, তোর জ্বরটা তো গেছে, শরীরে আর কোনও ব্যাধি নাই। তোর কিন্তু এই বাড়িতে বেশিদিন থাকা চলবে না। বড় জোর এক মাস। তারপর তোকে ঘরভাড়া নিয়ে সংসার পাততে হবে। নিজে রোজগার করবি, আমাদের কাছ থেকে আর কোনও সাহায্য পাবি না। তোর চেয়েও বেশি কোনও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করতে হতে পারে।

সেই কথা অনুযায়ী জোড়াসাঁকো অঞ্চলে সে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে পঁচিশ টাকায়। লীলাও কিছুটা লেখাপড়া জানে। মানিকও আপাতত একটা ছোট চাকরি পেয়েছে, একটা বেশ বড় মুদিখানায় হিসেব লেখার। এখানে সে কিছু মাইনে তো পাবেই, তাছাড়াও একটা সুবিধে এই যে, এখান থেকে যে চাল-ডাল পাবে বেশ সস্তায়। বাজারে যা চিনির দাম, এখানে তার প্রায় অর্ধেক।

দোকানটি গঙ্গার ধারে, একটা সেতুর কাছাকাছি। কাজ শেষ করে বেরিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতেই ভবানীপুরে যায়। মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়িয়ে নদীর বুকে সূর্যাস্তের সমারোহ দেখে।

কতরকম মানুষ বেড়াতেও আসে এখানে। সত্যিই কতরকম, চেহারা আর পোশাকেও। যেমন একদিন সে দেখল, একটা ব্যান্ড পার্টি যাচ্ছে বাজাতে বাজাতে, তার পেছনে যাচ্ছে মাথায় আধঘোমটা দেওয়া পাঁচজন রমণী, আর একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে একটা কাচের বাক্স। মানিক বুঝতে পারল এটা খ্রিস্টানদের কোনও পরবের ব্যাপার। তাদেরও পেছনে একটা হাতি চেপে আসছে এক জোড়া সাহেব-মেম। তাদের দেখার জন্যই দাঁড়িয়ে গেল মানিক। মেমসাহেবদের হাসির শব্দ শুনতে তার ভাল লাগে।

খ্রিস্টানদের ব্যান্ডবাদকরা মানিকের একেবারে কাছে এসে পড়ার পর সেই পাঁচজন মহিলার একজন একেবারে মানিকের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হালকা কৌতুকে বলল, কী রে মানিক, কেমন আছিস তুই? আমাকে বোধহয় চিনতে পারছিস না?

মানিকের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। সে অস্ফুটভাবে বলল, পদ্ম?

ছোটবেলায় এর সঙ্গে কত খেলা করেছে মানিক, ভারি দুরন্ত ছিল এই মেয়েটা, তারপর একদিন সে মানিককে বিয়ে করতে চেয়েছিল, বুড়ো বুড়ো কামার্তদের কবল থেকে বাঁচবার জন্য। মানিক রাজি হয়নি বলে এই মেয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে, আগুন লাগিয়ে মরতে গিয়েছিল। এই সেই পদ্ম?

পদ্ম বলল, তুই বুঝি ভেবেছিলি, আমি মরেই গেছি। না রে, আমার খুব কড়া জান। দু'একবার চেষ্টা করেও দেখেছি, কিছু হয় না।

মানিক মনে মনে একেবারে মর্মে এসে ভাবল, মাত্র আর কয়েকদিন আগে দেখা হলে সে তো পদ্মকেই বিয়ে করতে পারত। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। লীলাকে সে ত্যাগ করবে কী করে? তার তো কোনও দোষ নেই। হে ভগবান, তুমি আবার আমাকে এই সংকটের মধ্যে ফেললে?

পদ্ম বলল, আমি তো এখন মাস্টারনি হয়েছি রে। খড়গপুরে এক মেয়েদের স্কুলে পড়াই। তুই কী করিস?

মানিক প্রথমে শুধু দু'দিকে মাথা নাড়ল। তারপর প্রবল আবেগের সঙ্গে বলল, পদি পদি আমি তোর জন্য—

পদ্ম বলল, রক্ষে কর। আমার জন্য তোকে কিছুই করতে হবে না। আমাদের জীবন চলে গেছে দু'দিকে। এখন আমাদের বাস্তব জ্ঞানও আলাদা। সমুদ্রের ঢেউ যখন কাছে আসে, তখন কি তা হাত দিয়ে আটকানো যায়? সেইরকম আমাদের জীবনেও এমন কিছু কিছু ঢেউ এসে আঘাত দেয়, তাও হাত দিয়ে আটকানো যায় না। মেনে নিতেই হয়, তাই না!

মানিক উত্তর না দিয়ে ভাবল, সেই পদি এখন কতরকম জ্ঞানের কথা শিখেছে। তার একটা গাল কাপড়ে ঢাকা, তার শরীর বেশ পেটানো ধরনের, কথার মধ্যে সব সময় কৌতুকের সুর। সে বলল, আমি এবার চলি রে মানিক। কিন্তু তোকে খুব জীর্ণ-শীর্ণ দেখাচ্ছে। তুই কি হেরে যাচ্ছিস নাকি? না, না, হারলে তো চলবে না। আমার ইস্কুলের নাম শ্রী শ্রী জগন্মাতা বিদ্যালয়, লোকে মুখে মুখে বলে ঠাকুমা আর নাতনি ইস্কুল। যদি খুব দরকার হয়, আসিস আমার কাছে। খড়গপুরের কাছে গেলে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবি।

সে দৌড়ে ফিরে গেল নিজের দলের কাছে।

একসময় মানিক তাকে কোনও সাহায্য করতে পারেনি, এখন সেই পদ্মই তাকে সাহায্য দেবার প্রস্তাব করে গেল। আরও কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল মানিক। অল্প পরেই নেমে এল সন্ধ্যা।

তারও খানিক পরে এক বিকট শব্দ উঠল আকাশে। এতই জোর এই শব্দ যে, অনেক বাড়ির দরজা-জানলা কেঁপে উঠল ঝন ঝন করে।

এটা যে কিসের আওয়াজ, তা এখনও কেউ জানে না।

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী